— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

অমূল্য গ্রন্থাবলী

১ সরল ব্রহ্মচর্য্য
২ অসংযমের মূলোচ্ছেদ
৩ জীবনের প্রথম প্রভাত
৪ আদর্শ ছাত্র-জীবন
৫ আত্ম-গঠন
৬ সংযম-সাধনা
৭ দিনলিপি
৮ স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব
৯ প্রবুদ্ধ যৌবন
১০ কুমারীর পবিত্রতা (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)
১১ নবযুগের নারী
১২ গুরু
১৩ অখণ্ড-সংহিতা (১ম-২৪শ খণ্ড)
১৪ মন্দির (গানের বই)
১৫ মূর্চ্ছনা (গানের বই)
১৬ মঙ্গল মুরলী (গানের বই)
১৭ মধুমল্লার (গানের বই)
১৮ সমবেত উপাসনা
১৯ His Holy Words
২০ নববর্ষের বাণী
২১ বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য
২২ বিবাহিতের জীবন-সাধনা
২৩ সধবার সংযম
২৪ বিধবার জীবন-যজ্ঞ
২৫ কর্ম্মের পথে
২৬ কর্ম্মভেরী
২৭ আপনার জন
২৮ পথের সাথী
২৯ পথের সন্ধান
৩০ পথের সঞ্চয়
৩১ ধৃতং প্রেম্না (১ম-৩৮শ খণ্ড)
৩২ বন-পাহাড়ের চিঠি(১ম-২য় খণ্ড)
৩৩ শান্তির বারতা (১ম-৩য় খণ্ড)
৩৪ সাধন পথে
৩৫ সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৩৬ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা
৩৭ সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ

ইংরেজী বাণী সংকলন- The Message of Love

স্বরূপানন্দ সাহিত্য পাঠ করুন - আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা নিন।

অযাচক আশ্রম, রহিমপুর, ডাক - মুরাদনগর, কুমিল্লা - ৩৫৪০, হইতে প্রকাশিত ও অযাচক আশ্রম ট্রাষ্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

নিবেদন

যুগাচার্য্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আত্মবিস্মৃত জাতির ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য যে শ্রম করেছেন তা' কর্ম্মকুশলতার দিক দিয়েও শ্রেষ্ঠ, আবার ব্যাপকতার দিক দিয়েও অবিশ্বাস্য। তাঁর কায়িক শ্রমের কথা উল্লেখ না করেও কেবল তাঁর লিখা পত্র-সম্ভারের কথা চিন্তা করলেও অবাক হতে হয়। স্বদেশের অজানা অচেনা অথচ আত্মবিস্মৃত, এমন সম্ভাবনাময় জীবন আপনজনদের যে পত্রের মাধ্যমে দেশ সেবায় কর্ম্ম-কেশরীতে পরিণত করা যেতে পারে এ কথা সম্ভবত শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দের পূর্ব্বে কেহ চিন্তাও করেন নাই। পাশ্চাত্যের ভোগবাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সম্ভাবনাময় জীবনগুলিকে যখন দেশের স্বার্থ পদদলিত করে নিজের স্বার্থের প্রাসাদ নির্ম্মাণকে জীবনের লক্ষ্য বলে ধরে নিয়ে মানবতার কপালে স্থায়ী কলঙ্ক-টীকা এঁকে দেয়ার স্বপ্নে বিভোর তখন এ সন্ন্যাসী অজানা, অচেনা এমন লক্ষ লক্ষ জনের কাছে পত্র লিখে তাঁদের পৌরুষকে জাগ্রত করেছিলেন। এঁদের মধ্যে পরবর্তী সময়ে কয়েকজন জননন্দিত দেশনায়ক হিসাবে স্বদেশের সেবা করেছিলেন।

বৃটিশ-শাসিত বাংলার বিভিন্ন কর্ম্মীদের দেশের এক বিশেষ মুহূর্ত্তে জাতির যুব শক্তিকে জাগাবার জন্য অখণ্ডমণ্ডলেশ্বরের লিখা অসংখ্য চিঠির মধ্যে কয়েকখানা গ্রথিত করে "কর্ম্ম-ভেরী" আত্মপ্রকাশ করল।

আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, বিদেশীর লৌহ শৃঙ্খল আজ আর আমাদের জীবনের বিড়ম্বনা নয়। কিন্তু অপশাসনের নাগ-পাশ হতে আজও দেশ মুক্ত হয়নি। প্রতিশ্রুতির ভেল্কীবাজী সাধারণ মানুষকে করে চলেছে বিভ্রান্ত, যুব সমাজ আদর্শহারা, উদ্যমরহিত। তাই আজও এ অমূল্য গ্রন্থ বর্তমান সমাজের জন্য এক অমোঘ প্রেরণা।

এ গ্রন্থ হতাশার মনে আশা ফুটাবে, উদ্যমরহিতকে সৃজনশীল কর্ম্মে ব্রতী কর্ব্বে, দেশের কল্যাণে আত্মদানে প্রেরণা দেবে এ আশায় শ্রীগুরু করুণা-নির্ভর হয়ে "কর্ম্ম-ভেরী" প্রকাশ ব্রতী হলাম। ইতি- ১লা বৈশাখ ১৪১০ বাংলা।

অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা

নিবেদক :-
ডাঃ যুগল ব্রহ্মচারী

যাহারা–

উঠিতেই চাহে,

নামিতে চাহে না ;

চলিতেই চাহে,

থামিতে চাহে না ;

তাহাদেরই হাতে।

–স্বরূপানন্দ

যাহারা—

উঠিতেই চাহে,

নামিতে চাহে না ;

চলিতেই চাহে,

থামিতে চাহে না ;

তাহাদেরই হাতে।

—স্বরূপানন্দ

যাহারা—

উঠিতেই চাহে,

নামিতে চাহে না ;

চলিতেই চাহে,

থামিতে চাহে না ;

তাহাদেরই হাতে।

—স্বরূপানন্দ

ওঁ

কর্ম্ম-ভেরী

প্রথম পত্র

প্রিয়তম,

আজ নববর্ষ। এস আজ অতীতকে বিস্মৃতির গর্ভে সমাহিত করিয়া নূতন জীবনের নবামৃত প্রাণ ভরিয়া পান করিয়া লই। এস ভাই, আজ বিগতের বিপুল বেদনা হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিয়া শান্তির চন্দন-প্রলেপে স্নিগ্ধ করিয়া তুলি। এস আজ মুহূর্ত্তের মধ্যে শত বরষের সঞ্চিত গ্লানি বিদূরিত করিয়া দেই, ভবিষ্যতের আশারুণ-কিরণে স্নাত হইয়া উঠি। দুঃখ অনেক পাইয়াছি, তাহার জড়তা-বিজড়িত তিমিরাশ্রিত স্মৃতিকে জীবনের আলোকে জাগাইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই। বক্ষের পঞ্জরে পঞ্জরে অনেক আঘাত আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের চিহ্নগুলিকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া নিজের ক্লীবত্ব প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা হইয়াছে, তাহা হইয়াছে। যে আত্মাভিমান নিজেরই দোষে আপন অঙ্গে গড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহার কথা ভাবিয়া নির্ব্বাক নিষ্কর্ম্মা না হইয়া এস আজ ভবিষ্যতের আত্মপ্রতিষ্ঠা গড়িয়া লইবার জন্য বীরবেশে আগুয়ান হই। এস আজ হতাশার শ্রীহীন মুখমণ্ডলে পদাঘাত করিয়া আশার চঞ্চল জ্যোতিঃ আপনার মুখমণ্ডলে মাখিয়া লই। যাহাকে অনাদরে-অসম্মানে এতদিন পথের ধূলায় লুটাইয়াছিলাম, এস আজ সেই প্রাণের ঠাকুরটীকে অতি যত্নে— অতি সন্তর্পণে প্রাণমন্দিরে সপ্ততীর্থের সলিল-সিঞ্চনে অভিষেক করিয়া তুলিয়া লই। দুর্ভাগা আমরা ছিলাম— আমাদের শ্রমকুণ্ঠা, পরমুখাপেক্ষিতা ও আত্মসম্মান-বিহীনতার জন্য। কিন্তু আজ আমাদের প্রশস্ত ললাট হইতে সে কলঙ্করেখা মুছিয়া লইয়া এস আমরা একবার উৎসাহের বিজলী দিয়া ত্রিপুণ্ড্র রচনা করি। এস আজ চিরজাগ্রত অহংকারকে উদ্বুদ্ধ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করি,—"এ জগৎ আমারই, অপর কাহারও নহে।"

দীনতায় যাহারা শক্তিমানের চরণতলে অবলুণ্ঠিত হইতে চাহে, তাহারা হউক। – আমরা এই অহঙ্কারের ভিত্তির উপরেই আমাদের অক্ষয় বিজয়স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা দিব। যে বড় আছে, সে বড়ই থাকুক; আমরা তাহার অভ্রংলিহ স্পর্দ্ধার প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র করিতে চাহি না। কিন্তু আমাদের যে জীবন সাধনা, তাহাতে আমরা শক্তিমানের অনুগ্রহকণা না যাচিয়াই সিদ্ধিলাভ করিব। কাহারও উৎসাহ-বাণী চাহি না, কাহারও কর্ম্ম-প্রেরণার কাঙ্গাল নহি, আমরা আমাদের জীবন-দেবতার গোপন মুরলী শুনিয়াই আপনার পথে নির্ভীক প্রাণে ছুটিয়া যাইব। যাহারা পরকে সহস্র পীড়নে ক্লিষ্ট করিয়া নিজেদের সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে, যাহারা নিরন্নের কঙ্কাল পুঞ্জীকৃত করিয়া বিলাস-প্রাসাদ গড়িয়াছে, দরিদ্রের শোণিতধারা নিরন্তর পান করিয়া যাহারা পুষ্টদেহ-হৃষ্টহৃদয়, পতিতের বক্ষোবেদনায়–আর্ত্তের অসহনীয় মর্ম্মব্যথায় যাহাদের হাস্য-কৌতুকের অফুরন্ত ফোয়ারা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহাদের ছায়া-স্পর্শ আমরা করিব না। আপন স্পর্দ্ধায় জাগ্রত হইয়া আপন স্পর্দ্ধায়ই তাহারা ঢলিয়া পড়ে। তাহাদের জীবন নিমেষের জীবন, তাহাদের মরণ নিশ্চিত মরণ। উহাদের অনুগ্রহ আমরা যাচিব কিসের জন্য ? কি দিয়া তাহারা আমাদের স্বয়ম্প্রতিষ্ঠার জীবনকেও সমৃদ্ধ করিবে ?

এস আজ প্রাণ ভরিয়া একবার নিজেকে নিঃশেষে ভালবাসিয়া লই। ভাল না বাসিলে সহস্র বিপদের অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে নিজেকে নির্ভয়ে নিক্ষেপ করিয়া মনুষ্যত্বের অগ্নিলীলার অনুষ্ঠান করা চলে না। আমরা ত' স্বার্থসর্ব্বস্ব, হীনপ্রবৃত্তি বা ঘৃণ্যচরিত্র নহি। আমাদের 'আমি' ত' কুসংস্কারের অন্ধ কুঠরীতে সঙ্কুচিত ও আবদ্ধ নহে। দেহের সকল সুখ-সৌভাগ্য, দুঃখদুর্দ্দশার গুরু-ভার স্কন্ধে বহিয়া আমরা 'পূর্ণ আমি'। জাতির লক্ষ্য-হীনতা, ম্লান-মৌনতা, অপিচ সাময়িক সুখস্বাদের বিরল কলহাস্য-মুখরতা–সব লইয়া আমরা 'পরিণত-আমি'। এ 'আমি' নিজেকে সহস্রে দেখিতে চাহে, সহস্রকে নিজের ভিতর খুঁজিয়া লয়। সেই 'আমি'কে যদি ভাল না বাসিব, সেই 'আমি'-তে যদি বিশ্বাস না দিব, সেই 'আমি'ত্বের যদি অহংকার না করিব, তবে কিসের জন্য ভাষা শিখিয়াছি, কিসের জন্যই বা চিন্তার ক্ষমতা পাইয়াছি ? নিজেকে ভালবাসিয়াই আমাদের অক্ষিযুগল আত্ম-বিশ্বাসের জ্যোতিতে দীপ্তমান হইয়া উঠিবে, আপনারই তরে অতুল প্রীতি ঢালিয়া দিয়া আমাদের

হৃৎপিণ্ডে রক্ত-সঞ্চারের ঝঞ্ঝাচঞ্চল স্পন্দনের সৃষ্টি হইবে। তখনই আমরা আমাদেরই আঁখির দীপ্তিতে দেশের দুঃখমুক্তির চিরপ্রার্থিত মূর্তি দেখিতে পাইব, সেদিনই আমরা আমাদেরই প্রাণস্পন্দন প্রতিহৃদয়ে অনুভব করিব। শুধু তাই নয়, হৃদয় নাই বলিয়া যাহারা অনুভব করিতে জানে না, নির্জীবতায় যাহারা চিরমূক, তাহারাও সেদিন আমাদের হাসিতে হাসিবে –আমাদের ক্রন্দনে কাঁদিবে। অবোধ লোকে উপেক্ষা করিতে পারে, কিন্তু যথার্থ জানিও, যেদিন নিজেকে আমরা ত্রিশকোটি ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে খুঁজিয়া পাইব, সেদিন এই পুণ্যভূমির ধূলিকণাগুলিও জীবন পাইয়া উঠিবে। অতীতের কোটি বিস্মৃত গৌরব সেদিন পথের ধূলির মুখে কত ছন্দে বিধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

অবিশ্বাসের হাসি অনেকেই হাসিবে, কিন্তু প্রত্যয় রাখিও,–বিশ্ব-জগৎ আজ ভারতের পৌরুষ দেখিতে চাহিতেছে। যে পৌরুষ আত্ম-বিশ্বাসের উপর গড়িয়া ওঠে– কিছুতেই পরানুগ্রহলব্ধ হয় না, যে পৌরুষ স্বজাতির কল্যাণে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আত্মবলি দেয়,–আপন বাঁচাইতে দশের শিরে অসি নিক্ষেপ করে না, যে পৌরুষ সমুজ্জ্বলা রাজলক্ষ্মীকে বশীকৃতা করিতে অর্থ-অনর্থ, সুখ-দুঃখ, ক্ষয়-বৃদ্ধি কিছুকেই গণনায় আনে না, জগৎ সে পৌরুষ দেখিতে চায়। মনে রাখিও, ভারতকেই সে পৌরুষ দেখাইতে হইবে, যাহা মানব-সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম গৌরব শ্লাঘ্যতম অলঙ্করণ।

আর যেন আজ নিজের কল্পিত অসামর্থ্যের কথা ভাবিয়া ভাবিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া নিভৃতে বসিয়া না থাকি। বিধাতার বিজয়-বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছে। হে মানুষ, আজ তুমি আপনার মনোমত সাধনার পথ চিনিয়া লও।

চির-তোমারই

স্বরূপানন্দ

দ্বিতীয় পত্র

স্নেহাস্পদেষু ঃ-

সৎকার্য্যে দিন-ক্ষণের বিচার করিও না। প্রচণ্ড উৎসাহে কর্ম্মে লাগিয়া যাও। স্বকর্ম্মেই সমগ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত কর, অপর সকল বিষয় ভুলিয়া যাও। উহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিও না ।

নিজের পথেই চল। নিজের কথাই বল। পরচর্চ্চা হীনতাই আনিয়া দেয়।

মৃত্যুর মধ্যেও জীবনের বীজ প্রচ্ছন্ন থাকে। পতনের মধ্যেও উত্থানের সম্ভাবনা প্রসুপ্ত রহে। পতন-মৃত্যুর ভয়-রহিত হইয়া কার্য্য করিও।

যোগ-শক্তি দিয়াই জীবনকে মৃত্যুর অতীতের টানিয়া লইতে হয়। একাগ্রতাই শক্তি, -সেই একাগ্রতার সাধন কর।

সত্যনিষ্ঠাই মানুষের বল এবং ভরসা। ধর্ম্মই মানুষের একমাত্র অবলম্বন। কর্ম্মানুরাগই প্রতিষ্ঠালাভের একমাত্র পন্থা। অভিপ্সাসিদ্ধিই কর্ম্মপ্রতিষ্ঠার একমাত্র প্রমাণ।

কাহাকেও আঘাত করিতে না চাহিয়া নিজেরই বক্ষ আঘাতের জন্য পাতিয়া দাও। কর্ম্ম করিতে হইলে আঘাত সহিতে হয়। যে সহে, সেই রহে, অপরে নহে।

পরপীড়নে শক্তি বাড়ে না, হ্রস্বীভূত হয়। পরনিন্দায় গুণ বর্দ্ধিত হয় না, কমিয়া যায়। ইহারা বিষ-মহাবিষ, জীবনের মহাশত্রু।

বিষপান যে করে নাই, সিংহসাহসিকতা তাহার আপনিই জাগে, গজ-বিক্রম তাহার স্বতঃই বিকশিত হয়। বিকাশের পথ পরিষ্কার রাখ-বিক্রম আপনিই আসিবে।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

তৃতীয় পত্র

আশীর্ব্বাদভাজনেষু ঃ-

আগের কাজ আগে কর, পরের কাজ পরে ধরিও। যে কাজই ধরিতে চাহ না কেন, কাজটা যে তুমিই করিতেছ, কাজটা যে তোমারই জন্য করিতেছ, এই বুদ্ধিতে পূর্ব্বেই স্থিতধী হইয়া লইও।

কাজটা তোমারই বলিয়া তোমাকেই উহার জন্য জীবন দিতে হইবে। চঞ্চল মনটাকে একটা কিছু অবলম্বন দেওয়া চাই, অতএব বেগার খাটিতে বসিয়াছ,—এইরূপ প্রাণঘাতী বিশ্বাস রাখিলে আত্মোৎসর্গ করিতে পারিবে না।

প্রাণবিনাশের কারণ থাকিতে যদি বিগতভী হইতে পার, তবেই প্রকৃত প্রাণবান্ হইলে। নতুবা ডাকের সাজে সাজাইলেই দুর্গাপূজা হয় না।

কুকুরের পাল দিয়া কাজ হইবে না, কাজ মানুষেই করিবে। তুমি যে মানুষ, এই কথাটায় সুদৃঢ় নিষ্ঠা রাখিও; তাহা হইলে তোমার মনুষ্যত্বই তোমার কাণে ধরিয়া কাজ আদায় করিয়া লইবে।

কাজের প্রতি মমত্ববুদ্ধি জন্মিলে বাজে কাজ প্রাণভয়ে পলাইবে এবং কাজের কাজ আরম্ভ হইবে। —কাজগুলি যে তোমার, একথা স্বীকার কর। ভাল আছি। কুশল দিও।

শুভানুধ্যায়ী

স্বরূপানন্দ

চতুর্থ পত্র

স্নেহাস্পদেষুঃ-

যে ডাক শুনিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছ, উহা যদি মানুষের হইত, কখনই তুমি তাহা হইলে নিজের স্বার্থকে বলি দিয়া পরার্থকে প্রসন্ন করিতে চাহিতে না। যাহা তোমার প্রিয়তম, তাহাকেও যখন হেলায় পরিহার করিবার প্রেরণা পাইতেছ এবং সে প্রেরণাকে যখন ক্ষণিকের মোহ বা নিমেষের

উত্তেজনা নয় বলিয়া অন্তরে নিরন্তর উপলব্ধি করিতেছ, তখন উহা নিশ্চয় জীবন-দেবতার কাছ হইতে বরাবর ছুটিয়া আসিয়াছে, কাহারও মধ্যবর্ত্তিতার প্রসক্তি রাখে নাই। সত্য বটে, সে ব্রজবাণী মানুষেরই মুখ দিয়া উচ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু মানুষ যখন সত্যদর্শী হন, তখন তিনি আর সাধারণ মানুষেরই মত সরল ভাষায় কথা কহেন না, তখন তাঁহার শব্দবিন্যাসে ভাগবতী বিদ্যুৎ ঝলসিতে থাকে। সকলে তাঁহার ঘোর গর্জ্জন শুনিয়া প্রথমতঃ ভীত-ত্রস্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু ক্রমে অনুরক্ত ও ভাবাবিষ্ট হয়। এই ভাবাবেশ যখন গভীরতা পায়, তখনই উহা প্রেরণায় পরিণত হয়।

প্রেরণা চাই, নহিলে কাজ হয় না। প্রেরণা কর্ম্মের ধর্ম্ম। ইহা হইতে বিযুক্ত করিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে চাহিলে তাহা অপূর্ণ ও অসুন্দর রহিয়া যায়। প্রাণের যাহা কাম্য, তাহা কখনও অপূর্ণতা-বিসর্পী অথবা অসুন্দরমুখী হইতে পারে না। যদি তাহাই হইত, তবে আর বিশ্বজগতের নৈসর্গিক অনৈসর্গিক সকল দৃশ্যপটলে লীলায়িত ভঙ্গিমার বিচিত্র ক্রীড়া দেখিতে পাইতাম না। একাকী রহিয়া কেহই যেন আর তুষ্ট নয়, সকলেই যেন নিজেকেও অতিক্রম করিয়া অপরকে বুকে তুলিয়া লইতে চায়, নিজের যাবতীয় অপরিণত গরিমা ও মহিমা অংশতঃ-শ্রেষ্ঠ অপর কাহারও সম্মেলনে পরিপূরণ করিতে চায়। তুমি চাহিতেছ –তোমার অসংখ্য নগ্নদেহপদ ভ্রাতাভগ্নীর মধ্যে নিজেকে ছড়াইয়া দিয়া তাহাদের সুলভ সারল্যে নিজের শাঠ্যদিগ্ধ মনকে ভিজাইয়া ডুবাইয়া স্নিগ্ধ, স্নেহ-রস-লিপ্ত, কোমল ও নমনীয় করিয়া তুলিতে, আবার তাহারা চাহিতেছে,– তাহাদের শেলবিদ্ধ হৃদয়ের অসহনীয় যাতনা, রুদ্ধকণ্ঠের অস্ফুট কাতরতা তোমার জ্ঞান- বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বলা অভ্রভেদিনী মনীষার স্পর্শমণিতে একটি বার মাত্র স্পর্শ করাইয়া অতুল সহিষ্ণুতায় পরিণত করিয়া তাহারই অবলম্বনে দৃঢ়বিদ্ধ শেল সহজে উৎপাটিত করিতে, কাতরতার স্থলে তেজস্বিতার বিকাশ ঘটাইতে। তোমার ভিতরে এমন একটা দুর্লভ বস্তু কিছু আছে, যাহা আমার ভিতরে নাই। তাই, আমি সেই বস্তুটীকে লাভ করিবার জন্য তোমারই প্রতি উন্মুখ হইয়া পড়ি। আমি যে উন্মুখ হইয়া পড়ি, আমি আপনাতেই আপনভাবে বিভোর রহিতে পারি না, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে, তোমারই অন্তঃকরণের কোনও একটা আংশিক পূর্ণতার সোণার কাঠির স্পর্শ না পাইলে আমার অন্তরের

ব্যগ্রতা পূর্ণতায় পুলকিত হইবে না। একে অপরকে চিরদিনই চাহিয়া আসিতেছে, আবহমান কাল একজন আর একজনের– এক বস্তু অপর এক বস্তুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া পরিণতি পাইতে চাহিয়াছে। তাই বলিয়াছি, অপূর্ণতা বা অসুন্দরতা কাহারও প্রার্থনীয় হইতে পারে না। এক্ষণে যদি অসুন্দরতা আমার গ্রাহ্যই না হইল, তবে আমি কোন্ কুহকে ভুলিয়া পূর্ণতার ধারক ও বাহক প্রেরণা-ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াও কর্ম্ম-সাফল্যের আকাঙ্ক্ষা অণুমাত্র পোষণ করিতে পারি ? জগতের যত মনুষ্যত্বের নিদর্শন চিন্তায়, কথায় অথবা কর্ম্মের মধ্য দিয়া পরিরক্ষিত হইয়াছে, সকলগুলিই প্রেরণার কিরণে জ্যোতির্ম্ময়। যুগপ্রবর্ত্তক, ভাবপ্লাবক যত মহামানব মানব-সভ্যতার উপরে নিজেদের বিশিষ্টতার পদাঙ্ক রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রেরণার বলে বলীয়ান ছিলেন। প্রেরণাই প্রবুদ্ধাত্মা শাক্যমুনিকে রাজৈশ্বর্য্যের মায়া চিরতরে পরিহার করিয়া জগদ্ধিতায় ছুটিয়া আসিতে আকর্ষণ করিয়াছিল, প্রেরণাই যীশুখৃষ্টের মুখারবিন্দ হইতে ক্রুশ–বিধায়ক পাপিষ্ঠদের জন্যও স্বর্গস্থ পিতার নিকট হইতে ক্ষমা-প্রার্থনা উত্থিত করিয়াছিল, প্রেরণাই হজরত মহম্মদের মনে এবং বাহুতে অজেয় শক্তির সঞ্চার করিয়া দুর্নীতি-শৃঙ্খলিত আরবের শুষ্ক মরুভূমিতে নীতি ও ধর্ম্মের মুক্ত মন্দাকিনীর অমিয়-ধারা বহাইয়াছিল।

আজ তোমরা যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ,– বিশ্বাস অবিচলিত রাখিও, তাহাও তেমনই প্রেরণায় সঞ্চারিত, সঞ্জীবিত, সমুদ্ভাসিত। ইহাতে অনন্ত উন্মেষ আছে, প্রমোদন নাই; অনন্ত জীবন আছে, নিঃশেষ নাই, অনন্ত আলোক আছে, তিমির নাই। ইহা যুক্তির আঘাতে টলে না, অস্ত্রের আঘাতে হীনচৈতন্য হয় না। ইহা উজ্জ্বল কিন্তু চঞ্চল নহে, স্নিগ্ধ কিন্তু দুর্ব্বল নহে। ইহা প্রেমের জন্য জীবনদানে প্রোৎসাহিত করে, কিন্তু হিংসার কলুষে মলিন হয় না। ইহা সংযত করে, কিন্তু ভীরুতার গুরুভার স্কন্ধে ন্যস্ত করে না। বাধাবিঘ্নের ইহা পরিমাপ করে, ভয় পায় না,– ওজন লয়, পরাঙ্মুখ হয় না। বিশ্বাস করিও,– যাঁহার কাছ হইতে প্রেরণা পাইয়া বিশ্বমানব যুগে যুগে সীমাহীন দুঃখের পাথার নির্ভয়ে অতিক্রম করিয়াছে, প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেও বিশুদ্ধ কাঞ্চনের মতই নির্ব্বিকার রহিয়াছে, অধর্ম্মের প্রলয়-প্লাবনের মধ্যেও ধর্ম্মের পতাকা নিঃশঙ্কে উন্নত করিয়া ধরিয়াছে,– এ প্রেরণা তাঁহারই।

প্রেরণা তাঁহারই। বিশ্বাস করিও,– যাঁহার প্রেরণাবলে তৃণাদপি নগণ্য ব্যক্তিও দুর্দ্দান্ত দাম্ভিক অত্যাচারীর গর্ব্বিত মস্তক মুহূর্ত্তে পদানত করে, যাঁহার প্রেরণা আসিলে কীটাদপি জঘন্য ব্যক্তিও আত্মশক্তির ও আত্মাবলম্বনের বিকাশ ঘটাইয়া যুগযুগান্তরের অবমান-ভার নিমেষেরই মধ্যে স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিতে সমর্থ হয়,– এ তাঁহারই প্রেরণা। আরও বিশ্বাস করিও– আজ যেমন এই প্রেরণার আলোকে তোমার অন্ধতমসাবৃত ক্ষুদ্র হৃদয়খানা বিরাটের স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইয়াছে, যতদিন ঠিক এমনই করিয়া প্রতি দেশবাসী ইহাকেই প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি না করিবে, ততদিন তোমার প্রেরণাও সার্থক হইবে না।

দেশসেবায় নিজেকে অখণ্ডরূপে উৎসর্গ করিয়া দিয়া তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পার, নিজের সকল হীন স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া তুমি আত্মোৎকর্ষ ঘটাইতে পার, কিন্তু এই নিঃস্বার্থ আত্মপ্রসাদ ও আত্মোৎকর্ষ যতদিন পর্য্যন্ত তোমার দেশবাসী প্রত্যেক নরনারীর মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিতে না পারিতেছ, ততদিন জন্মভূমির প্রতি তোমার যে মহাকর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা উদ্‌যাপিত হইবে না। নিজেকে মুক্ত করিয়াই সাধনার পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিতে পার না। বহুর মধ্যে যে অমুক্ত সংস্কার আজ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহাকে জ্ঞানেরই তীক্ষ্ণ তরবারে শতধা ছিন্ন করিতে হইবে। আর যথার্থপক্ষে তখনই তুমি পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করিবে, যখন বহুর বন্ধন-বেদনা তোমারই বেদনার সহিত একযোগে ঘুচিয়া যাইবে। সেই দিনই তুমি মুক্তির আলোকে চিরারুণ হইবে, যে দিন তোমারই অপরাজেয় সাধনার ফলস্বরূপে সকলেই সে আলোক পাইয়া সতেজ ও সুন্দর হইবে।

ভাল আছি। ভগবচ্চরণে কল্যাণ কামনা করি। ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

পঞ্চম পত্র

কল্যাণবরেষু,–

বাদানুবাদে চিন্তার শক্তি বাড়িতে পারে, কিন্তু ইচ্ছার শক্তি বাড়ে না। ইচ্ছাশক্তি যোগশক্তিরই নামান্তর, অতএব তপোলভ্য। কল্পনার বিলাসে

উহা লাভ করা যায় না।

চিন্তার সহায়তায় লক্ষ্য স্থির করিয়া লইতে হয়, কিন্তু মন একই স্থানে কেন্দ্রীভূত না হইলে লক্ষ্যভেদ করা যায় না।

যেরূপেই হউক, লক্ষ্যভেদ করিতেই হইবে,- এই সঙ্কল্পে অটুট রহিও, কিন্তু দেহের উপর, মনের উপর, ইন্দ্রিয়ের উপর প্রভুত্ব না জন্মিলে সঙ্কল্প অটুট থাকে না।

ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তায় মস্তিষ্ককে পরিপুষ্ট কর, মস্তিষ্কের সবলতার সাহায্যে যুক্তি-বিচার-বিতর্ক দিয়া জীবনের লক্ষ্য নির্ব্বাচিত করিয়া লও, তারপরে একাগ্র সাধনের দ্বারা লক্ষ্যভেদ কর।

শুধু মস্তিষ্কের বলে দুঃখ ঘুচিতে পারে না। হৃদয়কে মস্তিষ্কের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। লক্ষ্যবস্তুকে হৃদয় দিয়া যিনি আচ্ছন্ন করিতে পারেন,- তিনিই লক্ষ্যভেদ করিবার মনঃস্থৈর্য্য লাভ করিতে পারেন।

বলহীনতায় সিদ্ধিলাভ হয় না। বলীয়ান্ হও, তেজীয়ান্ হও, কৃচ্ছ্রসহিষ্ণু হও। শক্তিলাভে এবং শক্তিপ্রয়োগে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য্য।

কিন্তু শক্তিপ্রয়োগ ব্যতীত শক্তিলাভ হয় না এবং শক্তিলাভ ব্যতীত শক্তিপ্রয়োগ করা যায় না। তবে অন্তর্নিহিত শক্তির সম্পদে কেহই দরিদ্র নহে। অতএব আলস্যে কালহরণ করিও না। কাজে লাগ—কাজে লাগ। বসিয়া থাকিও না।

কল্যাণকামী-

স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

স্নেহের,

তোমার বহুপূর্ব্বের পত্রখানার উত্তর এত দেরীতে দিতে বসিয়া একটু কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু আমার দোষ নাই ভাই, সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই।

নিজের স্বার্থ যে-সব আছে, তাহার মধ্যে দেশের স্বার্থ ও জগতের স্বার্থকে দেখিতে না পারিলে যে প্রাণের প্রসার বাড়ে না, সঙ্কীর্ণতা ঘোচে না, সে কথা তুমিও জান, আমিও জানি। এই জানা কথাটাকেই পরস্পরের মধ্যে নূতন করিয়া জীয়াইয়া না তুলিলে কিন্তু তোমার আমার চেনাশুনা ইহজীবনে কখনই হইবে না। তুমি যদি আমার পরিচয় পাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার কর্ত্তব্য হইবে, পরার্থের পাথরে আমার প্রাণটাকে ভাল করিয়া বাজাইয়া লওয়ার। পুনরায়, তোমার যথার্থ জীবনকে যদি চিনিতে হয়, তবে আমারও প্রয়োজন হইবে, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তোমার হৃদয়ের অন্তস্থল দেখিয়া লইবার। একের কাছে অপরের গোপন থাকিলে চলিবে না। যাহা সত্য, তাহা উলঙ্গ হইয়াই যেন তোমাকে আমাকে অহরহঃ প্রীতির অভিনন্দন দেয়, উহা যেন কদাপি মিথ্যার অলঙ্করণে, চাতুরীর মায়া-বসনে নিজেকে অসম্মান না করে। এইটুকু মনে রাখিয়া যদি তুমি-আমি পরার্থের কথা বলিতে চাহি, কথাগুলি সার্থক হইবে, প্রত্যেকটা অক্ষর-বিন্যাস আমাদের চরিত্রের সম্পদ বৃদ্ধি করিবে।

ভাবিতে গেলে, নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডীর ভিতরে আমরা বসিয়া থাকিতে পারি না– কিছুতেই। যাহাকে 'নিজের' বলিয়া ভাবিতেছি, যাহার জন্য হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর চোটে দেহ যায়-যায়, বুদ্ধিবৃত্তি অবশ ও পঙ্গু, ইন্দ্রিয় শিথিল, ভরসা হতাশালীন, তাহা আমার 'নিজের' কিসে এবং কেন? যাহাকে রাখিতে গিয়া অপর সকলকে পরিহার করিয়াছি ও করিতেছি, তাহা আমার অত আদরের, অত সোহাগের কেন ? এই কথাগুলির ঠিক ঠিক উত্তর চাহিতে গেলে জগতের সকল স্বার্থ নিমেষে বাতাসে মিশিয়া যায়।

যদি স্বার্থকেই দেখিলাম, এ স্বার্থকে সকল স্থানেই দেখি না কেন ? প্রতিবেশীর জঠর-জ্বালায় কি আমার স্বার্থ আহত হইতেছে না ? পরের ছেলের প্রাণের ব্যথায় আমার স্বার্থ কি বিষণ্ণ হইয়া পড়িতেছে না ?

আমার যে 'স্ব' বা আত্মা, তাহা নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ বা ক্ষুদ্রতার বাগুরা-বিস্তারে প্রসারহীন নহে। একথা কখনই সত্য নহে যে, আমার যাবতীয় অস্তিত্ব শুধু আমারই শাকস্থলীটার মধ্যে অথবা আমারই বাহ্য অথবা

অন্তরিন্দ্রিয়গুলির ভিতরে। একথাও গ্রাহ্য নহে যে, স্বোদর-পরায়ণতা মানুষের স্বভাব। আমার "আমি" যদি এই নশ্বর ইন্দ্রিয়গুলির তৃপ্তিতেই শেষ হইয়া যাইবে, তবে এগুলির ধ্বংসের পরে আমার নিজস্ব অবলম্বন কি থাকিতে পারে ? আমি যদি শুধু দেহেরই হিসাব রাখিবার জন্য রহিলাম, তবে এ দেহ গেলে আমার উপায় কি ?

মোটের উপর, প্রত্যেকেই আমরা পরের তরে। অর্থাৎ লৌকিক কি পারলৌকিক উভয়বিধ অস্তিত্বেই আমরা আমাদের পঞ্চভূতাত্মক দেহকে লঙ্ঘন করিয়া স্বতঃ বিরাট এক অসীম, এই কথাটার দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর না দাঁড়াইলে মানুষের মন শান্তি পায় না। আত্ম-তুষ্টি চাও কি ?– যদি এ সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠা গড়িয়া লইতে না পার, তবে আত্ম-তুষ্টি মিলিবে না। ঐ যে ছিন্নবসন ক্ষুধার্ত্ত বালক পথপাশে দাঁড়াইয়া অবিরল ধারায় অশ্রুমোচন করিতেছে, নিজের মুখের অন্ন দিয়া, নিজের গায়ের বস্ত্র দিয়া যদি তাহার দুঃখ বিমোচন না কর, জগতের কুত্রাপি তোমার জন্য অর্দ্ধ রতি আত্ম-তুষ্টি রহিবে না। পরকে সুখ না দিলে তোমার সুখ আসিবে না, পরের অশ্রু না মুছাইলে তোমার অশ্রু মুছিবে না।

ইহা কেন, বলিতে পার ?– তুমি এবং পর যে একাত্ম, ইহা তাহারই প্রমাণ। সৌর জগতের একটী গ্রহ কক্ষচ্যুত হইলে সকল গ্রহই অবস্থান্তর পায়। কারণ, কেন্দ্র–শক্তির বৈষম্য ঘটিয়াছে। স্থির সরোবরের মধ্যদেশে একটী ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি কর, সমগ্র জলরাশি আন্দোলিত হইয়া উঠিবে। ঠিক তেমনি একটী মানবাত্মার ব্যথা-বেদনা, অভাববোধ এবং দৈন্য-কাতরতা সকল মানবাত্মার কাছে বিষণ্ণতা বহিয়া নিবেই। পরের দুঃখ দেখিলে যে অনেক সময় নিতান্ত ক্রুরচিত্ত কঠোর-হৃদয় কুলাঙ্গারও কাঁদিয়া ফেলে, তাহার একমাত্র কারণ এই অব্যক্ত একাত্মতা।

স্থির শৈশব হইতে চঞ্চল যৌবন ভরিয়াই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, মানুষগুলি নিজেকে নিয়াই ব্যস্ত, আপনার স্বার্থ লইয়াই পাগল। তাই, আমরা প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রতিবেশকে অনুসরণ করিতে যাইয়া নিজের চারিদিকে স্বার্থের একটা দৃঢ় গণ্ডী বাঁধিয়া ফেলিয়াছি। সংস্কার গড়িয়া লইয়াছি যে, যেখানে স্বার্থ নাই, সেখানে আমরাও নাই, পরন্তু যেখানে স্বার্থের গন্ধ

বিন্দুমাত্র আছে, সেখানে আমরা পূর্ণ সত্তায় বিরাজমান। কিন্তু যতই কেন বাঁধন আটিয়া দেই না, বন্ধন থাকিলে তাহার মুক্তি আছেই, থাকিবেই। যতই আমরা নিজের বিরাট্ স্বরূপকে দুইটা ঝুঁঠা স্বার্থের কথা বলিয়া সঙ্কুচিত করিয়া দিতে চাই, ততই উহা আরও উপচিয়া ওঠে– বাঁধন মানিতে চাহে না। যাহা সত্য, তাহা শত মিথ্যার ছায়াপাতেও অনুজ্জ্বল হয় না। তাই, পারিপার্শ্বিক আমাদের মনোজগৎটাকে যতই আঁধার করিয়া দেউক না, অন্তর-দেবতা পাঞ্চজন্যের মাভৈঃ ধ্বনি করিয়া আমাদিগকে বিগতভী করিয়া তোলেনই।

যতই নির্দ্দয় তুমি হও না কেন, তোমার কঠিনতারও এমন একটা সীমা আছে, যাহা অতিক্রম করিয়া তুমি যাইতে পার না। যতই নিষ্ঠুর করিয়া তুমি নিজেকে গড়িয়া তোল না কেন, এমন একটা সরসতা তোমার মধ্যে রহিয়া যাইবেই, যাহা শত নির্ম্মমতার দাবদাহেও শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না। তাই, তুমি একটা না একটা পর-লাঞ্ছনে আত্ম–লাঞ্ছনার বেদনা পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়।

ইহা মানুষেরই স্বভাব। যত বড়ই আমরা নিজেকে ভাবি না কেন, দুঃখাহতের ব্যথার চরণে মাথাটা একদিন না একদিন অবনত হইয়া পড়িবেই। যত দাম্ভিকই হই না কেন, পরকে অধঃপতিত দেখিয়া তাহাকে তুলিয়া আনিবার জন্য একদিন না একদিন আমাদিগকে নীচে নামিতেই হইবে। কিন্তু ইহাকে দুর্ব্বলতা বলিয়া মনে করিবার হেতু নাই। তোমার অঙ্গে অপরের কশাঘাত পড়িয়াছে, তুমি তাহার প্রতিকার করিতে অসমর্থ বলিয়া যদি ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া কাঁদিতে থাক এবং ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়িতে আরম্ভ কর, আমি তোমাকে দুর্ব্বলতম কাপুরুষ বলিয়াই ডাকিব। কিন্তু পরের পেষণে,– উহা মানুষেরই হউক অথবা বিধাতারই হউক,– যাহারা জীবনেও মরিয়া আছে, তাহাদিগকে মরণেও অমৃতত্বে সঞ্জীবিত করিবার আকুল আগ্রহ লইয়া যদি তুমি দু'ফোটা চোখের জল ফেলিলেই, কে বলে উহা দুর্ব্বলতা ? বরং আমি বলিব, উহা তোমার সবল হৃদয়ের সজীব স্ফূর্ত্তি। পরের দুঃখ দেখিয়া যদি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিলেই, আমি বলি উহা চন্দনগন্ধবাহী বসন্তের মলয়-পবন।

বিশ্বাস করিও না, পরকে স্নেহ করিয়া তুমি বিন্দুমাত্রও দুর্ব্বল হইয়াছ। স্বীকার করিও না, পরের জন্য স্বার্থ বলি দিয়া তুমি অনুতাপার্হ অপকর্ম্ম করিয়াছ। ভাল আছি। কুশল চাই। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

স্নেহাস্পদেষু ঃ—

শার্দ্দূল সন্দর্শনে শঙ্কিত হইও না, মনে রাখিও, উহাকে শিকার করিতে হইবে। ব্যাঘ্র-চর্ম্ম চাই নতুবা যোগ-সাধনার প্রকৃষ্ট আসন আর কি দিয়া হইবে ?

মহাকাল শার্দ্দূল-চর্ম্মে লজ্জা রাখিয়াছেন। বীরত্বেরই মধ্য দিয়াই সম্মান রক্ষিত হইবে, বিজেতৃ-গৌরবের সঙ্গেই প্রতিষ্ঠা আসিবে, মুহুর্মুহুঃ কম্পমান হইলে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব।

ভয় দেখিলে চলিবে না, দুর্ব্বলতাকে ভয় দেখাইতে হইবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

কল্যাণবরেষুঃ—

অপর কাহারও মতামত আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তোমার মতও পরিবর্ত্তিত করিতে হইবেই, এমন কথার কোনও সঙ্গত কারণ আমি দেখিতে পাইলাম না। তোমার মতামত যদি পরিবর্ত্তনের

প্রয়োজন চাহে, তবে তাহা একমাত্র তোমার আত্মগত আদর্শেরই মুখ চাহিয়া, অপরের আচরণের গতি চাহিয়া নহে। বন্য বর্ব্বরেরা উলঙ্গ থাকে বলিয়াই তুমিও উলঙ্গ থাকিতে প্রস্তুত আছ কি ? আদিম নিগ্রোরা মৌমাছি ধরিয়া খায় বলিয়া তুমিও খাইবে কি ? সাপের স্বভাব ছোলম্ বদ্‌লান। তার জন্য তোমাকে কি নিজের গাত্রচর্ম্ম উৎপাটন না করিলেই চলিবে না ? তোমাকে ঠিক তোমার মতনই থাকিতে হইবে, কাহারও অন্ধ অনুকরণ করিলে চলিবে না। জগৎশুদ্ধ লোকও যদি একমত হয়, তথাপি তোমাকে তোমার পথেই চলিতে হইবে। ইহারই নাম পুরুষকার, ইহারই নাম বীর্য্যবত্তা।– বীর্য্যবান্ হও, শক্তিমান্ হও, জগৎসমক্ষে "পুরুষ" বলিয়া পরিচয় দিবার স্পর্দ্ধা অর্জ্জন কর।

জগতে যাঁহারা মহৎ বলিয়া গণিত, তাঁহারাও তোমার আদর্শ নহেন। তাঁহাদের চরিত্রগত বা কর্ম্মগত আংশিক উৎকর্ষ বর্ত্তমানতায় অথবা সম্ভাব্যতায় তোমার নিজস্ব হইতে পারে, কিন্তু কোনও সৃষ্ট জীবেরই অখণ্ড-চরিত্র তোমার নিজস্ব হইতে পারে না। সকল খণ্ড যে অদ্বিতীয় অখণ্ডের অংশীভূত, তাঁহাকেই একমাত্র জীবনের আরাধ্য করা চলে। নতুবা, নিজ হাতে গড়া লৌহ-নিগড়ে নিজের চরণ শৃঙ্খলিত করিয়া আবার সেই বন্ধনই কাটিতে কাটিতে কত জন্ম চলিয়া যায়, তাহার হিসাব কে করিবে ?

মানুষ নিজে নিজের প্রভু, নিজে নিজের নেতা। জগতের কোন গুরু, কোন আচার্য্যের আদেশের অপেক্ষা রাখিবে না। প্রাণ যাহা চাহে, তাহাই করিয়া যাও– ইহার বেশী কি বলিতে পারি ?

পরের কথা তোমার গ্রাহ্য হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ কি ? কিন্তু উহা গ্রহণ করিবার সময় ভিক্ষা করিয়া চাহিয়া আনিও না। আমরা যে শুধু অর্থই ভিক্ষা করি, তাহা নহে, আমরা ভাবও ভিক্ষা করি। আর ভিক্ষা করি বলিয়াই ঐগুলি ইহজন্মেও কদাপি আমাদের নিজস্ব হয় না।

দাসবুদ্ধি লইয়া ভাবের যাচাই করিতে গেলে উহার যাচাই করা আর হয় না, মোহবশে উহাকে পরম অনুগ্রহের দান বলিয়া গ্রহণ করিয়া ফেলা হয়। আর আত্মবুদ্ধি বা মর্য্যাদাবুদ্ধি লইয়া ভাবের যাচাই করিতে গেলে উহা বিচারান্তে গ্রাহ্য বিবেচিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে গৃহীত হয় না বরং

ভাব সজ্ঝাত-প্রভাবে আত্মগত সুপ্ত চৈতন্যকে জাগ্রত করে এবং তাহার সহিত উহার সামঞ্জস্য উপলব্ধ হয়।

তুমি কি স্বয়ং অতুল সমৃদ্ধির আকর নহ? ভাবের সমৃদ্ধি, বাক্যের সমৃদ্ধি, কর্ম্মের সমৃদ্ধি সকলই কি তোমার প্রকৃতিগত সম্পদ নহে? তবে তুমি কোথায় চাহিতে যাইবে? তবে তুমি কাহার খোশামুদি করিয়া রাজার ছেলে হইয়াও মুদির ঘরের কলমপেশা বৃত্তি যাচিয়া লইবে?

যাহারা গৃধ্রের মত শুধু গলাধঃকরণ করিয়াই যায়, তাহারা ভাব-জগতের কেরাণী ছাড়া আর কি? মহাজনের সূদের হিসাব কষিয়া কষিয়া জন্মযুগ খোয়াইলেও তাহাদের আপন ঘরে একটা কাণা-কড়ি যায় না।

হইতে পারে, বড় লোকেরই মতি বদলাইয়াছে, কিন্তু তাতে তোমার কি? তুমিই বা এমন কোন্ ছোট লোকটা? আজ যাঁরা বড়'র পূজা পাইয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের কর্ম্ম, তাঁহাদের পুণ্য ও তাঁহাদের যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার পূর্ণ সম্ভাব্যতা কি তোমারও মধ্যে নাই?—শুধু বাহির কর, ভিতরকে প্রকাশিত কর, অন্তরকে অভিব্যক্তি দাও।

চাষার ছেলে লাঙ্গল কাঁধে করিলেও চাষার ছেলে, রাজ সিংহাসনে বসিলেও চাষার ছেলে। আবার রাজার ছেলে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া ভ্রমিয়া বেড়াইলেও তাহার পিতৃপরিচয়টা লোপ পায় না, সে রাজার ছেলেই থাকে। অবস্থার বিবর্ত্তন মান-সম্মানের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে কিন্তু পিতৃ-পরিচয় মুছিয়া দিবার বা রক্ত-সম্বন্ধের বিলোপ-সাধন করিবার ক্ষমতা রাখে না।

তুমি কি অমৃতের সন্তান নও? আজ যাঁরা বড়'র মর্য্যাদা কর্ম্মবলে, সাধনবশে, তপস্যার ফলে পাইয়াছেন, তাঁহারাও এই অমৃতেরই সন্তান। তবে আবার নিজেকে ছোট ভাবিয়া পিছু পিছু ছুটিতে চাহ কেন?

যাহারা বড় হয়, তাহাদের লেজ থাকে না যে, তুমি ধরিয়া তাহাদের পিছে পিছে সমান পায়ে চলিবে। আর তাহাদের যদি লাঙ্গুল থাকিতেই, তাহা হইলেও উহাতে এত শক্তি থাকিত না যে, অমৃতের সন্তানকে টানিয়া নেয়।

নিজের মুক্তিদাতা তুমি নিজে। নিজের প্রাপ্য পরকে দিয়া নিজে নিঃস্বতার মিথ্যা ছদ্মবেশ পরিও না। কেহ কাহারও বশ্য নহে, কেহ কাহারও

আয়ত্তে নহে, কেহ কাহারও ভ্রূকুটীর অধীন নহে। জগতের প্রতি পরমাণু নিজ নিজ হিসাবে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। তবে, নিজেরা খণ্ড হইলেও এক অখণ্ডের সহিত সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া প্রত্যেকেরই মধ্যে একটা ঐক্যভাব রহিয়াছে। কিন্তু ঐ ঐক্য সতীর্থতার এবং ঐ সতীর্থতা সমতার। কেহ ছোট নয়, কেহ বড় নয়, এক সাম্যবিধানে একে অন্যের পার্শ্বলগ্ন।

যাহা বলিতেছি, তাহা আমারই মনের কথা। ইহা যে তোমারও মনের কথা হইবে, কাণের কথাই মাত্র রহিবে না, তাহার স্থিরতা নাই। কিন্তু যদি উহাই হয়, তবে তাহা এই হিসাবে হইবে যে, তোমার স্বাধীন মত এবং আমার স্বাধীন মত বিপরীত দিক হইতে সমপথ পর্য্যটন করিয়া একস্থানে আসিয়া মিলিয়াছে এবং প্রকৃতির সাম্যহেতু আলিঙ্গন -পাশে বদ্ধ হইয়াছে।

সব কথাকেই তলাইয়া বুঝিতে শিখ, নতুবা বিষম বিপদে পড়িবে। এই বিচিত্র জগতে লক্ষ জীব লক্ষ প্রকারে আপন স্বরূপ অর্থাৎ শিবত্ব ফুটাইয়া তুলিতেছে। কিন্তু তার জন্য তাদের চরণে ক্রীতদাস হইয়া ইহ-পর-জীবনের সকল কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাকে বিকাইয়া দিতে হইবে, তেমন কথা কিছু আছে কি? ★ ★ ★ ভাল আছি। কুশল প্রার্থনীয়।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

নবম পত্র

প্রাণের—

স্তব্ধ নিশীথে তুর্য্যনিনাদ শুনিলে যেমন হয়, তোমার পত্র আমাকে ঠিক তেমনই চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

হাঁ, ইহাই চাই। উদ্যত বজ্র দেখিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিয়া যাইবে, গ্রাহ্য করিবে না, —ইহাই চাই। পিশাচের অট্টহাসে শঙ্কিত হইবে না, সবল চরণে দলিয়া যাইবে, —ইহাই চাই। ভীষ্মের তুমি বংশধর নও? দধীচির

রক্ত শিরায় শিরায় বহে না ? তাঁহাদেরই মত মৃত্যুলাঞ্ছন হইবে, তাঁহাদেরই মত ভীরুতা-বিজয়ী হইবে,—ইহাই চাই। চাই আজ তোমাদের বুকে অদম্য সাহস, চাই আজ তোমাদের বাহুতে অসীম শক্তি, চাই আজ তোমাদের হৃদয়ে অতল সহৃদয়তা। ঘোষণা কর, সাহস তোমার দুর্জ্জয়, অনবসন্ন, অমলিন,—কোন বাধাতেই পরাভব পায় না, কোন বিভীষিকায় শঙ্কাশীর্ণ হয় না। মেঘেরই মত গর্জ্জিয়া উঠিবে, ভূকম্পেরই মত তাণ্ডব নাচিবে, বিদ্যুতেরই মত বিপদের বুকে পলকে পলকে ঝলশিতে থাকিবে, আজ আমার প্রাণ ইহাই চায়। তৃপ্তি চাহি না, চাহি তীব্র অতৃপ্তি, চাই অসন্তোষের খাণ্ডব-দাহন।

একথা আজ দেশের ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দাও। অল্পকে লইয়া তুষ্ট রহিব না, বেশীকে চাই। ছোটকে লইয়া তৃপ্ত থাকিব না, বড়কে চাই। কদর্য্যকে পাইয়াই আহ্লাদ আটখানা হইব না, সুন্দরকে চাই। আকাঙ্ক্ষাকে পরিমিত করিয়াই আমরা ছোট হইতেও ছোট হইয়া পড়িয়াছি। আজ সকলকে বল, —আকাঙ্ক্ষাকে দূরবিসর্পিণী করিতে। আজ সকলের প্রাণে সেই প্রেরণাই অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দাও, যাহাতে জগতের সকল সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে, সকল যোগ্যতা কুড়াইয়া আনিতে মানুষ বিপদকে তুচ্ছই করিবে। কোনও সম্পদ হইতে নিজেকে বঞ্চিত রাখিবে না, ইহাই আজিকার সিদ্ধিমন্ত্র হউক।

নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভের জন্য কৃচ্ছ্র-সাধনের প্রয়োজন নাই। পার যদি, আকাঙ্ক্ষার আরতি দিতে সর্ব্বস্ব সমর্পণ কর। দাউ দাউ করিয়া জঠর-অনল জ্বলিয়া উঠুক, সমগ্র বিশ্বটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবার আগে যেন সে অনল নিভিয়া না যায়। দুমুঠা নীবার-কণায় তুষ্ট রহিও না। ক্ষীরের সাগর চাই, সরের পাহাড় চাই, বিগলিত নবনীর সরিৎ-প্রবাহ চাই।— নরনারী প্রত্যেককে আজ এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তোল।

কুকুরের সন্তোষ শিখিলে কুকুরই থাকিতে হয়, মনুষ্যত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয় না। আকাঙ্ক্ষার উদ্বেল তরঙ্গে আন্দোলিত করিয়া দেশকে আজ মানুষ করিয়া তোল। আমরা ত' কীট-পতঙ্গ নই। আমরা ত' ছাগ-মেষ নই। আমরা মানুষ, আমরা শক্তিমান, আমরা বুদ্ধিজীবী। তবে আমরা

দুঃখের ভয়ে সন্তোষের আশ্রয় চাহিব কেন?

যাহা কিছু সহজলভ্য, তাহাকে লইয়াই যদি তুষ্ট রহিলাম, তবে ত' আমি ঘোরতর কাপুরুষ। দুঃখ আছে বলিয়াই আমি সত্যকে চাই, লাঞ্ছনা আছে বলিয়াই আমি সিদ্ধিকে চাই। হলাহল উৎপন্ন হইবে জানিয়াও আমি সমুদ্রমন্থনে ব্রতী হইয়াছি। কারণ, আমি জানি, চির-আকাঙ্ক্ষিত অমৃত অনেক সাধনায়—অনেক বেদনায় মিলে।

একথা আজ প্রত্যেকেরই মুখে ধ্বনিত হউক। প্রত্যেকে জানুক, কাপুরুষ থাকা মহাপাপ। প্রত্যেকে বুঝুক, অমৃতকে লাভ করিতেই হইবে।

দুর্ব্বল কখনও অমৃতকে পাইয়াছে কি ? উদাসীন কখনও অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে কি ? "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" উত্থান-পথে আকাঙ্ক্ষার সহায়তা চাই।

★ ★ ★ ★

তোমার গুরু—গম্ভীর পত্র যেন বাক্যমাত্রেই পর্য্যবসিত না হয়, তার দিকে দৃষ্টি রাখিও। বিধাতা কুশল করুন।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দশম পত্র

প্রিয়—

সত্যের তোমরা সেবা করিতেছ, আর মানুষ তোমাদের কথা শোনে না, এ আবার কেমন কথা হে! যত তিমিরাচ্ছন্নই হউক না কেন, মানুষ আলোকেরই পুত্র। যত অবসন্নই হউক না কেন, সবলতারই সে উত্তরাধিকারী। তাহার প্রাণে প্রতিনিয়তই সত্যের যে মুরলী ধ্বনিয়া উঠিতেছে, উহাকে স্ফুটতর করিয়া দেওয়াই তোমার কাজ। তবে আবার তোমার মুখে নিরাশার কথা শুনি কেন ?

তোমরা সত্যেরই প্রচার করিতেছ, তথাপি যে তাহা আদৃত হইতেছে না, তাহার অন্য কারণ থাকিতে পারে। হয় ত' যেমনটি করিয়া বলিলে মানুষ কাণ পাতিয়া শোনে, তেমন ভাবে বলা হইতেছে না। হয় ত' যেমন ভাবে কাজ করিলে বড় মানুষের-দেওয়া পরিচয়-পত্রের প্রয়োজন হয় না, তেমন ভাবে কাজ চলিতেছে না। কথাই যদি বলিতে হয়, তবে এমন করিয়া বলিও, যেমন কথা আর কেহ বলিতে সমর্থ নয়। কাজই যদি করিতে হয়, তবে এমন কাজই করিও, যাহা আর কেহ করিতে পারে নাই। ব্যক্তিত্বে অনন্যসাধারণ হওয়া চাই, কর্ম্মনিষ্ঠায় অভূতপূর্ব্ব হওয়া চাই। নহিলে কাক-শকুনীর কথায় কেহ কর্ণপাত করে না বা ফণোগ্রাফের রেকর্ডে সে কথা গাঁথিয়া রাখে না।

সত্যের প্রচার করিতে হইলে সত্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে, মিথ্যাকে চিরনির্ব্বাসন দিতে হইবে। কাজ করিব সত্য, কথা বলিব সত্য, চিন্তা করিব সত্য, এমন কি ঘুমের ঘোরে যে স্বপ্নটা দেখিব, তাহাকেও বাস্তবতার বেদীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইব। সত্যে আমি প্রতিষ্ঠা পাইব, সত্য আমাতে প্রতিষ্ঠা লইবে। তবে ত' আমি প্রচারক। তবে ত' আমি ব্যাখ্যাতা। মিথ্যার আশ্রয় লইব না, মিথ্যাকে প্রশ্রয় দিব না, জীবনের প্রত্যেকটী খুঁটি-নাটিতে পর্য্যন্ত সত্যকে বজায় রাখিব, তবে ত' লোকে আমার কথা শুনিবে।

কিন্তু সত্যের সেবা করিতেও যে আমরা কত সময়ে মিথ্যার সহায় হই, তাহা আমরাই জানি না। সত্যকে প্রচার করিতে যাইয়া কতবার আমরা নিজেকেই প্রচার করিয়া বসি, সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে যাইয়া নিজেকেই প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, নিজেকে প্রচারই আমাদের লক্ষ্য নহে। সত্যকে প্রচার করিবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আমরা প্রকাশ হইব। আত্মপ্রচার করিবার জন্য সত্যের বিজয়ধ্বজা উড়াইব না। বরং তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রচারক, শিক্ষা যাঁহার জাতির জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া তোলে কিন্তু বংশ-পরিচয় যাঁহার চিরদিনই গোপন রহিয়া যায়। তিনিই শ্রেষ্ঠ প্রচারক, ব্যক্তিত্ব যাঁহার আবালবৃদ্ধবনিতায় সংক্রামিত হইয়া পড়ে কিন্তু প্রতিমা যাঁহার কল্পনার গোধূলিতেই ফুটিয়া উঠে। মিথ্যা-প্লাবনের

মধ্যে যদি সত্য-সৌধের ভিত্তি-পত্তন করিতে চাও, গভীর জলের নীচে মাটি খুঁড়িতে হইবে, যেখানে কেহ তোমাদিগতে দেখিবে না–চিনিবে না।

তারপরে আরও একটি কথা আছে। তোমার কথা তুমি প্রচার করিয়া যাও, কিন্তু তোমার মত অবলম্বন করিতে লোকের উপরে জিদ্ করিও না। বলিয়া যাও তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধির কথা, কিন্তু না বুঝিয়া যেন উহা স্বীকার না করে। এমন ব্যাখ্যান করিয়া যাও, সকলেই যেন বলিতে বাধ্য হয়, –"আচ্ছা, একবার ভাবিয়া দেখি।" তাহাদিগকে ভাবিতে শিখাও, পরের মুখে ঝাল খাইয়া নিশ্চিন্ত রহিতে দিও না। তোমাদের কথা যদি সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়, তাহারা যেন নির্ভুলরূপেই দেখিয়া লয় যে, উপলব্ধির নিকষ-পাষাণে সোণারই দাগ পড়িয়াছে। অনেকে মরীচিকা দেখিয়া ভুলিয়াছে, তাহাদিগকে ভাবিতে শিখাও। যাহারা অন্ধ-বিশ্বাসের অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে স্থির চিত্তে বিচার করিয়া দেখিতে বল। জোর-জুলুম করিও না, সত্য-প্রচার জবরদস্তির কাজ নয়।

ধর্ম্মান্ধতা কাহাদের হয় জান ? –যাহাদের নিজেদের কোনও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় নাই, পরের মুখের ব্যাখ্যা শুনিয়া যাহারা ধর্ম্মের স্বরূপ বুঝিয়াছে বা বুঝিতে চাহিয়াছে। অগভীরা নদীর স্রোত ত' দেখিয়াছ ? কিন্তু অগাধ জলের তরঙ্গ নাই। প্রকৃতই যাঁহারা সত্যের আস্বাদন পাইয়াছেন, তাঁহাদের উন্মাদনা নাই। তাঁহারা ধীর, গম্ভীর, অচঞ্চল। অন্ধকে তাঁহারা আলোর দিকে টানিয়া নেন– অতি সন্তর্পণে, হ্যাঁচ্‌কা টানে খঞ্জ করিয়া দেন না। তোমরা শুধু অগণিত মূর্খকে জানিতে দাও যে, তাহাদের কাছেও বিশ্বজগৎ জ্ঞানের ভিখারী। সিংহ-শিশুকে জাগাইয়া তোল, তাহাকে বুঝিতে দাও যে, সে শৃগাল-শাবক নহে।

সত্যপ্রচারের মহাব্রতে সিদ্ধিলাভ কর, ইহাই আমার একান্ত কামনা। ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

একাদশ পত্র

স্নেহের—

তোমার পত্র পাইয়াছি। * * * এত দুঃখ শুধু দুঃখই নহে, সুখও বটে।

লোহা কাটিতে ইস্পাতের যন্ত্র চাই বলিয়াই তোমার জীবনটা চির-নবীন রহিয়াছে। দুরন্ত শত্রুর নিঃশেষ করিয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিতে না ফেলিতেই আবার যে ততোধিক বলবান্ আর একটা শত্রু তোমার গমন-পথের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইতেছে, ইহাকে একেবারে ব্যর্থই মনে করিও না। ইহারা তোমাকে প্রতি প্রয়াসেই একটা নূতন যোগ্যতা দিয়া যায়,—ক্ষমতা প্রভাবে তাহাকে নিজের করিয়া লওয়াই পরম পুরুষার্থ। তুমি যে চির-নবীন, চির-প্রবাহমান, চির-বিচিত্র, সে শুধু কত বিপদের কত ধরণের সংগ্রাম-লীলার মধ্য দিয়া তুমি নিজের উচ্ছ্বাসকে ক্রমেই ফুটাইয়া তুলিতেছ বলিয়া। তুমি যে সদা-সুন্দর, চির-কমনীয়, উহা শুধু দুঃখের সহিত মল্লযুদ্ধে বিষম হুটাহুটি লুটাপুটীর মধ্যে তোমার যাহা কিছু অসুন্দর, যাহা কিছু কুৎসিত, তাহাই পথের ধূলিতে গড়াইয়া পড়িতেছে বলিয়া। লোহার হাতুড়ীর ঘা বিশ্রী শুনায় বটে, কিন্তু প্রত্যেকটা আঘাতেই উহার শত বৎসরের মরিচাগুলি ঝরিয়া পড়িতে থাকে?

আগুন লাগিয়া তোমার যদি আবাস-বাটি পুড়িয়া যায়, পুড়িলই বা। বেদান্তের টীকা ত' বাঁচিয়াছে। যাহা পুড়িবার তাহা পুড়িবেই। কিন্তু সিন্দুকে পুরিয়া যে মোহর রাখিয়া দিয়াছি, তাহা গলিতে পারে, কিন্তু পুড়িবে না।

গুপ্তশত্রু লাঠির আঘাতে তোমার কাঁধের হাঁড়ি-পাতিল ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, কিন্তু পুঁটলীর মধ্যে যে ঘোরকৃষ্ণ শিলা—খণ্ড চক্‌চক্ করিতেছে, তাহা ত' আর গুঁড়া হইবে না। লাঠিয়ালের লাঠি ভাঙ্গিবে, কিন্তু শালগ্রাম অখণ্ডই রহিবে, খণ্ড হইবার নয়।

নবীন থাকিলে চালিবে না। একটুকু তাপে গলিয়া যাইবে, অধিক উত্তাপে জ্বলিয়া উঠিবে, অমন হইলে কখনও চলে নাই, এখনও চলিবে না। সমুদ্রের শাঁখা হওয়া চাই। দুঃখের দু—ধারী করাতে শঙ্খশিল্পী ভগবানের

হাতে আমাদিগকে যার যার মত হইয়া গড়িয়া উঠিতে হইবে।

যে বাটালী দিয়া ভাস্কর তার মানসী-প্রতিমা পাথরের গায়ে ফুটাইয়া তোলে, সে বাটালীরও ত' হাতুড়ীর বাড়ি না খাইয়া উপায় নাই। বাটালী এ দুঃখটুকু যদি সহিতে নারাজ হয়, অনুভূতিহীন পাথরের বুকে অনুভূতিশীলা মাতৃমূৰ্ত্তি খুদিয়া তুলিবার অসীম শ্লাঘা হইতে যে সে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া রাখে!

বিধাতার শুভেচ্ছা যে বিপদের পর বিপদ দিয়াই আমাদিগকে পূর্ণ ও পরিণত করিয়া তোলে, এইটাই সব চেয়ে বড় আশ্বাসের কথা। পিঠের উপর বোঝা চাপে, বুকের উপরে আঘাত লাগে, শুধু যে ভগবানেরই আদেশ মানিয়া, এইটুকুই সৰ্ব্বাপেক্ষা বেশী সত্য। আবার, এ বোঝার ভারে বাঁকিয়া না যাওয়া, এ ব্যথার ভয়ে পিছাইয়া না পড়া যে বিধাতারই অভিপ্রেত, ইহাও পরম সত্য।

সকল দেশেরই মহাপুরুষেরা যে যুগে যুগে শুধু দুঃখই পাইয়া গেলেন, এত দুঃখ সহিবার ক্ষমতা তাঁহারা কোথায় পাইলেন ? এই যে তাঁহারা কোন অত্যাচার, অবিচার, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার প্রতি ভ্রূক্ষেপই করিলেন না, এ অসীম সহিষ্ণুতা তাঁহাদিগকে কে দিল ? এই কথাগুলি ভাবিতে গেলেও দুঃখবোধ থাকে না।

মোট কথা, করিতে হয়, অপরে করুক, —দুঃখ, বিপদ, শোক, সন্তাপ এগুলিকে আমরা গ্রাহ্য করিব না। আমাদের ত' আর অজানা নাই যে, পৃথিবীর শত ঝড়—ঝঞ্ঝা আমাদিগকে ভগবানেরই কোলে নিয়া পৌছাইবে।

পরের পত্রে তোমার দুঃখ-বিজয়-মহাকাব্যের আরও দুই চারি সর্গ পাঠাইও। প্রার্থনা করি, কাঁটার মালায় তোমার মাথার মুকুট শোভিত হউক। ইতি—

আশীৰ্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দ্বাদশ পত্র

প্রিয়—

তোমার ঠিকানা জানি না বলিয়া পত্রাদি লিখিতে পারি নাই। বহুদিন পূর্বে যে এক ঠিকানা দিয়াছিলে, তাহা একেবারেই দুর্ব্বোধ্য। তাই আন্দাজী ঠিকানায় যে উত্তর দিয়াছিলাম, তাহা তোমার হস্তগত হয় নাই। তৎপরে আর কোনও পত্র লিখিও নাই।

ভুলিবার না-ভুলিবার কি কথা আছে ভাই? মানুষের জীবনাদর্শ যদি উজ্জ্বল হয়, মহৎ হয়, তবে সে বিশ্ব -দেবতার মঙ্গল-আরতির প্রত্যেক পুরোহিতের কাছে আপন হইয়া দাঁড়াইবে। পরিচিত-অপরিচিত, নূতন-পুরাতন, বালক-বৃদ্ধ, এ সকল বিবেচনার সে কোনও অপেক্ষা করিবে না। যেখানেই প্রেমের মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছে, সেইখানেই সে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া পড়িবে। যেখানে কেহ পূজার অঞ্জলি দিয়াছে, সেখানেই সে সকলের সাথে বর মাগিয়া লইবে। ইহার মধ্যে ভ্রম কি স্মৃতির প্রশ্ন আসে ?

আসল কথা হইতেছে আমাদের আদর্শের ঐক্য বা এক-প্রাণতা লইয়া। তোমার আমার লক্ষ্য ও আদর্শ যদি বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত বা বিরূপ হয়, তাহা হইলে যতই বলি না কেন যে, আমি তোমাকে ভুলি নাই, কিছুতেই তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিও না। আর যদি একই ভাবের আবেগে তোমার আমার উভয়েরই দু' নয়নে সুরধুনী-ধারার মত ধারা বহিতে থাকে, যদি একই অনুপ্রাণনায় উভয়েরই কর্ম্মৈষণা জাগিয়া উঠে, যদি একই প্রেরণা পাইয়া উভয়েই মান-অপমান, সুখ-দুঃখ, প্রতিষ্ঠা-পতন সকলকে সমজ্ঞান করিয়া থাকি, তাহা হইলে লক্ষ বলিলেও বিশ্বাস করিও না যে, আমি তোমাকে ভুলিয়াছি। যদি আমরা একই পথে চলিয়া থাকি, একই দেবতাকে শয়নে, স্বপনে, নিশি-জাগরণে জীবন-মরণের প্রিয়তম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি, তাহা হইলে তোমাতে আমাতে পার্থক্য কোথায় যে, আমি তোমাকে ভুলিয়া যাইব ?

মানুষ নিজেকে কখনও ভোলে কি ? আপন চিন্তা মানুষকে কখনও পরিত্যাগ করে কি ? যখন মানুষ পরের জন্য পাগল হয়, তখন বুঝিও, সে

পরের মধ্যেই নিজেকে পাইয়াছে, পরের ভিতরই আপন স্বরূপের সন্ধান তাহার মিলিয়াছে। মানুষ নিজেকে ভোলে নাই বলিয়াই পরকে অত স্নেহে, অত আদরে বুকে জড়াইয়া রাখে। মানুষ নিজেকে বিস্মৃত হয় নাই বলিয়াই উপকৃত অকৃতজ্ঞকেও সে আবার উপকার করিতে যায়, অত্যাচারী কলসীর কাণা মাথায় ভাঙ্গিলেও এই জন্যই সে তাহারও জন্য ভগবদাশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করে। মানুষ নিজেকে কখনও ভোলে না, ভুলিতে চাহে না, ভুলিতে পারে না। অতএব সে অনুযোগ দেওয়া একান্ত বৃথা।

তুমি আমার নির্দ্দেশমত কাজ আরম্ভ করিয়াছ জানিয়া বাস্তবিকই আনন্দিত হইয়াছি। 'কুলি' বলিয়া যাহাদিগকে ঘৃণা করিতেছি, তাহাদিগকে যদি 'কুলীন' বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে না পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ তিমিরাবৃত। এই সকল তথাকথিত ছোট-লোকেরা যখন তাহার ন্যায্য অধিকারের জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া দাঁড়াইবে, তোমার সমাজ তখন ইহাদের তেজস্বিতার অনলে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে। তখন ইহারা তোমার দেহে এমনই প্রচণ্ড আঘাত করিবে যে, তোমাদের নিজেদেরই শোণিত-প্লাবণে নিজেরা তলাইয়া যাইবে, বড় মানুষী টিকিবে না। যদি অসীম দুঃখের মধ্যে ভূ-পতিত হইতে না চাও, অসময়ে যদি বুকের উপরে অপমানের দারুণ পদাঘাত সহিতে না চাও, তাহা হইলে নিজেদের আকাশস্পর্দ্ধী মান-সম্মানকে একটু খর্ব্ব করিয়া আনিয়া অবজ্ঞাত, অনাদৃত ইহাদিগকে তাহার কতকটা অংশ দাও। ইহাদের সমান একদিন তোমাদের হইতেই হইবে, কিন্তু যদি সসম্মানে ইহাদের মনুষ্যত্বকে স্বীকার কর, অপমানিত হইবে না।

দেহটা ভাল নহে। তোমাদের খবর দিও। ইতি–

তোমার

স্বরূপানন্দ

ত্রয়োদশ পত্র

কল্যাণবরেষু ঃ–

য–র পত্রে তোমার চেষ্টা-উদ্যোগের কথা শুনিয়া পরম পুলকিত হইয়াছি।

বাঙ্গালী জাতিটার একটা প্রধান দোষ এই যে, তাহারা বিনা আয়াসে কার্য্যসিদ্ধি করিতে চায়। সে প্রকৃতি যেন আমাদিগকে আর না পায়। আমরা যেন সবচেয়ে বড় দুঃখ পাইয়াও সব চেয়ে ছোট কাজটীকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে সম্মত থাকি। এই বিষয়ে আমাদিগকে 'অতি-বাঙ্গালী' হইতে হইবে।

'বড় কাজ' 'বড় কাজ' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে চীৎকার না করিয়া যদি আমরা সব থেকে ছোট কাজটীকে বিশ্বস্ততার সহিত সম্পাদন করিতে ব্রতী হইতাম, তাহা হইলে এমন কোনও বড় কাজ আজ থাকিত না, যাহা আমাদেরই কর্ম্মকৌশলে সম্পাদিত না হইত। যে কখনও ছোট কাজ করে নাই, সে কি কখনও বড় কাজ করিতে পারে?

আমি তোমাকে প্রথমেই বড় কাজে হাত দিতে পরামর্শ দেই না। আগে ছোট কাজটী করিয়া তোল, তোমার কর্ম্ম-শক্তির পরিচয় দাও,–তারপরে বড় কাজ ধরিও।

এখন তুমি যে কাজ করিতেছ, তাহা ছোট কাজ। কিন্তু এই ছোট কাজটার সমাপনে যদি প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিতে পার, একদিন তুমিই সব চেয়ে বড় কাজটা করিয়া ফেলিবে।

প্রত্যহ প্রার্থনা করিও। বিধাতার আশীর্ব্বাদ প্রতি মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা পাইও। চরিত্র-মাধুর্য্যে সুন্দর হইও। একনিষ্ঠায় উজ্জ্বল হইও। ইহাই আমার চরম উপদেশ। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

চতুর্দ্দশ পত্র

স্নেহের,–

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। যত বড় কাজ করিতে চাও, দুঃখ তত বড়ই সহিতে হইবে। আদর্শ যত উচ্চ, বিপদও তত বেশী। রীতিমত

সামর্থ্য লাগে বলিয়াই ত' বিশ মণ বোঝাটাকে যিনি অবলীলাক্রমে কাঁধের উপর তুলিয়া লইতে পারেন, তিনিই বাহাদুর। পাহাড় বাহিয়া উঠিতে হইলে পায়ের কব্জিতে জোর চাই। নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে সকল দুঃখ সহিয়া যাওয়াই পুরুষকার; আর যাঁহারা পুরুষকারে শক্ত মাটির উপর একবার দাঁড়াইতে পারিয়াছেন, অদৃষ্ট তাঁহাদের চরণের দাস।

আমরা যদি না ভুলিয়া যাই যে, অসত্যের উপরে সত্যের জয়কে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের জীবনের সাধনা, তাহা হইলে দুঃখ পাইয়া আমরা হতাশ হইব না; বরং তাহাতে আমাদের উৎসাহ বাড়িবে। ব্যথা-বেদনা, ভয়-বিভীষিকা মিথ্যাবাদীর জন্য, মিথ্যাচারীর জন্য; আমাদের জন্য নয়। কশাঘাতে দেহ ফাটিয়া রক্ত ঝরিতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য কাঁদিব কেন? বরং হাসিব, আনন্দ করিব, এইজন্য যে, বিপদের মুখে পড়িয়া আমাদের মনুষ্যত্বের একটা পরীক্ষা হইয়া গেল, সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়া আমরা একটা বিরাট বীরত্ব অর্জ্জনের সুযোগ পাইলাম। সুযোগ জীবনে অনেকবার আসে না ; অতএব পাইলে ছাড়িতে নাই।

ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া তুমি যদি চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ কর, মুচীর হাতের জল খাও, তাহা হইলে তোমার সমাজ ও আত্মীয়-স্বজন তোমাকে বর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু তোমার অন্তর-দেবতা তোমাকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরিবেন। যাঁহার সোহাগ পাইলে বিশ্বজগতের ভ্রূকুটীকে অগ্রাহ্য করা যায়, তিনি তোমাকে কোলে তুলিয়া লইবেন। সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে যাইয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত অসত্যের অত্যাচারে জর্জ্জরিত না হইবে, ততক্ষণ সত্য-স্বরূপ অন্তর-দেবতা জাগিয়া ওঠেন না। তাই, আরও শ্লেষ, বিদ্রূপ, অপমান, লাঞ্ছনার দরকার আছে।

সবই বুক পাতিয়া সহিয়া যাও। তোমার ঐ বিশাল বুকে অসত্য কয়টা আঘাত করিতে পারিবে? পুণ্যময়ের পুণ্য ইচ্ছায় মুহূর্ত্তে পাপ পদানত হইবে। ভয় কিসের?

দেবতা যখন আশ্বাস দিয়াছেন, কোলে তুলিয়া লইবেন, তখন দুঃখ সহিতে দুঃখ কি? যাঁহার আঁখির ইঙ্গিতে মরুভূমি শ্যামল হইয়া যায়, অতলস্পর্শ লবণাম্বুতে মরকত-মালার মত দ্বীপপুঞ্জ অরুণালোকে ঝলসিয়া

উঠে, তাঁহার আশিস পাইয়া আমরা ভয়ভীত রহিব কেন? যাঁহার করুণাটুকু বাদ দিয়া মুহূর্ত্তকালও জীবন চলে না, সেই পরমপিতার আদেশবাণী প্রতিপালন না করিলে ত' চলিবে না।

প্রাণ শুধু সত্যই চাহুক, মিথ্যাকে চিরতরে বিসর্জ্জন দেউক। শুধু সৎকেই চাহুক, অসৎকে উপেক্ষা করুক। যাহা জীবন-মরণে সঙ্গী নয়, তাহাকে চাহিয়া লাভ কি আছে ? যাহা চির-কল্যাণকে জাগ্রত করে না, তাহার জন্য ব্যস্ত হইও না, পরন্তু সত্যকে পূর্ণ মর্য্যাদা দান করিবার জন্য সকল বিপদকে ডাকিয়া আনিতে দ্বিধা বোধও করিও না। কাজই যদি করিতে হয়, পুরুষের মত করিও। কথাই যদি বলিতে হয়, মানুষের মত বলিও। বুক ফুলাইয়া যদি প্রাণের কথা বলিতে না পার, তবে নিঃশব্দ থাকিও। দণ্ড-পুরস্কারকে যদি অগ্রাহ্য করিতে না পার, কাজে হাত দিও না। কথায় অকপট হও, কার্য্যে অকপট হও। মিথ্যা বীরত্বে অথবা সাহসের ভাণে দিগ্বিজয় হয় না।

সত্যের সেবায় আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সত্যাবলম্বী হইতে হইবে। এই সব দুঃখগুলি যে আমাদের অস্তিত্বলোপ করিতে পারে নাই, সে কেবল সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী বলিয়া।

ভাল আছি। * * * ইতি-

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পঞ্চদশ পত্র

স্নেহের,

রাত্রিশেষে স্বপ্ন দেখিলাম, বাঙ্গালার সবগুলি লোক লাঠি ধরিয়াছে, আমার বুকের উপর দারুণ আঘাত করিয়া বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা পাইতেছে। তারই কয়েক ঘণ্টা পরে হ-র পত্রে জানিলাম, তোমার বিবাহের জন্য তোমার পিতা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার ইচ্ছার প্রবল প্রতিরোধ দিতে পারিতেছ না বলিয়া তুমি আত্মহত্যার সঙ্কল্প করিয়াছ।

এই স্বপ্ন এবং এই সত্য, এতদুভয়ের মধ্যে কোনও সংস্পর্শ-সূত্র আছে কিনা বিবেচ্য।

তোমার হৃদয়ের কোন্ পরতে কতটুকু দৌর্ব্বল্য রহিয়াছে, তাহা আমার কিছু কিছু জানা আছে। তবু আমি একথা কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারি না যে, জীবনটাকে তুমি একটা খেলার জিনিস পাইয়াছ। ব্যক্তি মাত্রেরই কোথাও না কোথাও একটা দূর্ব্বলতা আছে। তোমারও আছে, আমারও আছে, শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদেরও ছিল। কিন্তু উহা মানুষের স্বভাবজ নহে, সংস্কারজ। প্রতিবেশ হইতেই উহা জন্মে, প্রতিবেশ হইতেই উহা শক্তি ও পুষ্টি সঞ্চয় করে। তাহাকে দূরীভূত করিতে মানুষ মুহূর্ত্তে পারে,—শুধু ইচ্ছা থাকিলেই হয়। তোমার দুর্ব্বলতাকে তুমি যে তাড়াইতে চাহ না, ইহা অপেক্ষা বড় রকমের আশ্চর্য্য ব্যাপার আমার কাছে আর কিছু হইতে পারে না। অথচ মনটাকে একটু সতেজ করিয়া লইলেই কিন্তু তুমি সব করিতে পার।

যাহারা সংস্কারের মোহে সত্যকে অগ্রাহ্য করে, তাহারা দুর্ব্বল। যাহারা দুর্ব্বলতাকে চিনিয়াও দূর করিতে না চাহে, তাহারা আরও দুর্ব্বল। আর যাহারা একটা দুর্ব্বলতাকে ঢাকিতে যাইয়া শত দুর্ব্বলতাকে ডাকিয়া আনে, তাহারা দুর্ব্বলতম। তুমি কি চাহ যে, আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হই, তুমি ইহাদের অন্যতম, এমন কি নিকৃষ্টতম?

আমরা দুর্ব্বল, একথা যদি কেহ কহে, তবে জানিও, যার চেয়ে বড় অপমান আমাদের হইতে পারিত না, তাহাই হইয়া গেল। নিজের সবলতায় ভয় পাইয়া যদি কেহ তোমার দৌর্ব্বল্যে বা কাপুরুষত্বে ধিক্কার দিবার অবসর পায়, জীবনকে নিরর্থক মনে করিও। কারণ, দুর্ব্বলতা আমাদের নিজস্ব নহে। যাহা আমাদের নিজস্ব নহে, অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশপথে যাহার অভিব্যক্তি নহে, সেই চটুল, অপ্রকৃত, অসিদ্ধ বস্তুর প্রসক্তিতে লজ্জা পাইতে আমরা প্রস্তুত থাকিব কেন? আমরা দুর্ব্বল নহি; সবলতাই আমাদের স্বভাবসিদ্ধ সম্পত্তি। শক্তির আমরা কাঙ্গাল নহি। আমরা উহার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিকারী। আমাদের এই অধিকার খণ্ড নয়—অখণ্ড, আংশিক নয়— সম্পূর্ণ, কাল্পনিক নয়—বাস্তবিক। কেন তুমি তবে এই স্বভাব-প্রবর্ত্তিত পূর্ণতার স্কন্ধে মিথ্যা [illegible] ইতে পরকে সুযোগ করিয়া দিবে?

বিবাহ করাটা সব সময়েই একটা কিছু অন্যায় ব্যাপার নয়। জাতির হিতের জন্য, মানব-সমাজের কল্যাণের জন্য, ভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের পারম্পর্য্য রক্ষার জন্য বিবাহ প্রয়োজন এবং পুণ্যজনক। আবার কামের তৃপ্তির জন্য, একপাল ক্রীতদাসের সৃষ্টির জন্য, ভিক্ষুকবৃত্তির চিরস্থায়িত্বের জন্য বিবাহ মহাপাতক। বিবাহার্থীর প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন– বয়স, বিদ্যা বংশ নহে, পরন্তু উপযোগিতা। এই যে বিরাট্ ভাগবতী লীলা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া চলিয়াছে, ইহার পূর্ণতা তোমার বিবাহের দ্বারা সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া সত্যই তুমি বিশ্বাস পোষণ কর কি ? এই যে অনন্তযুগ ব্যাপী পূর্ণতাভিসর্পী ক্রম বিকাশ হইতেছে, তাহার নীরব ইঙ্গিত তোমাকে দাম্পত্য জীবনের পথে ছুটিতে প্রেরণ করিতেছে কি ? এই প্রশ্নের অকপট উত্তরের উপরই তোমার বিবাহ সম্বন্ধীয় যাবতীয় সমস্যার সমাধান নির্ভর করিবে। কিন্তু ভাই, উত্তর দিবে কি, প্রাণটা খুলিয়া একবার বলিবে কি ? কোন্ পথ তোমার কাছে সব চেয়ে বেশী উপযোগী মনে লয়? বিবাহিত জীবনের –না কৌমার্য্যের ?

যদি বুঝিয়া থাক, বিবাহিত জীবনে তুমি নিজের অস্ফুট শক্তিকে বেশী করিয়া ফুটাইতে পারিবে, তবে তোমার পক্ষে কৌমার্য্য নিরর্থক। যদি বুঝিয়া থাক, কুমার জীবনে তুমি সহস্র জীবনের কাজ একই জন্মে করিয়া যাইতে পারিবে, তবে তোমার পক্ষে বিবাহ একটা বিষম ভ্রান্তি। তুমি কি করিলে ভ্রান্ত, আর কি করিলে অভ্রান্ত, তাহা নির্ভর করিবে–তোমার মুখের কথায় নয় ভাই, তোমার প্রাণের অনুভূতিতে। তোমার উপলব্ধিলব্ধ জ্ঞানের উপরে, অপর কোনও জ্ঞানের আসন নাই। অতএব, তোমার স্বতশ্চেষ্টিত উপলব্ধির বিচারে যাহা ঠিক, তাহাই ঠিক, আর সকল বেঠিক। তোমার উপলব্ধির বিচারে যাহা সত্য, তাহাই সত্য, আর সকল অসত্য।

তবে আত্মহত্যা করিতে চাও কেন ? কারণ থাকিতে পারে দুইটী, তিনটী কিছুতেই নয়। প্রথমতঃ বিবাহিত জীবনই তোমার কাম্য, কিন্তু বন্ধু-স্বজনের কাছে চিরদিনই অকুণ্ঠ কণ্ঠে বলিয়া আসিয়াছ যে, নিঃসঙ্গ জীবনের সকল কঠোরতা সহিয়াও তুমি কুমারভাবে দেশের সেবা করিবে। আর এক্ষণে বিবাহের আয়োজন ক্রমেই ঘনাইয়া আসিতেছে বলিয়া বন্ধু-বান্ধবের সম্ভাবিত বিদ্রূপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চিরতরে তাহাদের চক্ষুর অন্তরালে রহিতে চাও। দ্বিতীয়তঃ, কুমার-জীবন তোমার হৃদয়ের

সকল সদ্‌বৃত্তিগুলিকে এমনই প্রবল আকর্ষণে সন্নিকট করিয়া ফেলিয়াছে যে, বিবাহ করিলে তোমার মনুষ্যত্ব আত্ম-প্রস্ফুটনের পথ পাইবে না বলিয়াই তুমি দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর, কিন্তু পরমারাধ্য পিতার কথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার যোগ্য সৎসাহসটুকু সঞ্চয় করিতে পারিতেছ না বলিয়া কৌমার্য্যের মূলগত উদ্দেশ্যটুকু বিস্মৃত হইয়া তুমি মৃত্যুর করাল গ্রাসে গড়াইয়া পড়িয়াও কুমার রহিতে চাহ।

যদি বন্ধুদের ভয়ে মরিবার সঙ্কল্প করিয়া থাক, তবে তোমার প্রথম দুর্ব্বলতা– নিজের হৃদয় যথার্থরূপে না জানিয়া বৃথা আস্ফালন করা। আর দ্বিতীয় দুর্ব্বলতা–সেই দুর্ব্বলতাকেই ঢাকিতে যাইয়া আত্মহত্যার আশ্রয় লওয়া। আত্মহত্যা একটা দুর্ব্বলতা। অন্যান্য দুর্ব্বলতার সীমার পরিমাপ চলে, কিন্তু আত্মঘাতীর দুর্ব্বলতা অসীম। তাই, এপথে চলিয়া তুমি নিকৃষ্ট শ্রেণীর দুর্ব্বল পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে। যদি পিতাকে ভয় করিয়া মরিতে চাও, তবে তোমার প্রথম দুর্ব্বলতা–তাঁহার কাছে মনোভাব বজ্রকণ্ঠে ব্যক্ত করার অক্ষমতা, আর দ্বিতীয় দুর্ব্বলতা–সেই অক্ষমতাকেই আত্মহত্যারূপ অপর একটা জঘন্য অক্ষমতার অন্তরালে গোপন রাখিবার চেষ্টা। কিন্তু ভাই, শাক দিয়া মাছ ঢাকিতে পারিবে কি? কাটা কাণ চুল দিয়া লুকান যাইবে কি?

আমার মতে, ভুল যদি কোথাও কিছু করিয়া থাক, তবে তাহাকে আর প্রশ্রয় দিবার প্রয়োজন নাই। নির্লজ্জেরই মত নিজের ভ্রম স্বীকার করিয়া লইয়া ভ্রমহীন পথে নির্ভয়ে ভ্রমণ কর। যদি বুঝিয়া থাক, তোমার বিবাহে দেশের কল্যাণ বাড়িবে, তবে বন্ধুদের বিদ্রূপ গ্রাহ্যে আনিও না। যদি বুঝিয়া থাক, তোমার কৌমার্য্যে জাতির দুর্ভাগ্য ঘুচিবে, তবে পিতার অমর্য্যাদার ভয় রাখিও না। দেশের যদি সৌভাগ্য আনিতে পার, তাহা হইলে একদিন আসিবে, যখন তোমার প্রতি গতিভঙ্গী সকল সুহৃদের সন্তোষ সঞ্চার করিবে। মায়ের মুখ যদি উজ্জ্বল করিতে পার, একদিন আসিবেই, যে দিন তোমার কৌমার্য্যকেই তোমার পিতা তাঁর পক্ষে সব চেয়ে বড় মর্য্যাদা বলিয়া স্বীকার করিতে গৌরব বোধ করিবেন। আজ সরল হও ভাই, অকপট হও। নিজের প্রাণের আবৃত আদর্শকে অনাবৃত কর।

আচ্ছা, আত্মহত্যা করিতে চাহিতেছ ত'। বেশ কথা। কিন্তু ভাই, বাঁচিয়া বাস্তবিকই আছ কি ? যে বাঁচা বাঁচিলে মানুষের মরণ স্বাভাবিক হয়, সে বাঁচা বাস্তবিকই ইহজীবনে দু'চারি দণ্ড বাঁচিয়াছ কি ? ★ ★ ★ কোন্ বাঁচার গর্ব্ব করিবে ভাই, যে, আজ তুমি মরিবার স্পর্দ্ধা রাখ ?

মরিবার পথ আরও আছে। দেশ যখন সকল দুঃখে মুহ্যমান, সকল বেদনায় আকুল, সকল দীনতায় অবলিপ্ত, তখন আত্মহত্যা ছাড়া মরিবার পথ অনেক আছে। মরিতে যদি অত সাধ, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানগুলিতে একবার ছুটিয়া যাও, নিজের মুখের গ্রাস নিরন্নের মুখে তুলিয়া দিতে শ্রমে-ক্লান্তিতে- অবসাদে চিরতরে চক্ষু বোজ। ম্যালেরিয়ার অসহ্য হলাহলে গ্রামের পর গ্রাম উৎসন্ন হইয়া যাইতেছে, অগণিত নরনারীর ব্যাধিমুক্তি ঘটাইতে আপ্রাণ কষ্ট সহিয়া সেখানেই ঢলিয়া পড়। ভারতের আনাচে-কানাচে অপরিমিত জমি জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়া চির-অন্ধকারে আবৃত রহিয়াছে, সেখানে অমরার আলোক ফুটাইয়া তুলিতে প্রাণ দাও। মরিতেই যদি হয় ভাই, দেশের জন্য মর। তুচ্ছ একটা মানের খাতিরে, বিদ্রূপের ভয়ে মরিতে চাও, তোমার জীবনের মূল্য অতই অল্প!

ভাইরে, মরিতে হইলে ইতিহাসের মরণ মরিও। যে মরণ দু'জন আত্মীয়-বান্ধবের সাময়িক অশ্রুজল ছাড়া আর কোনও সঙ্গীর গরব করিতে পায় না, সে আবার একটা মরণ কি ? যে মরণে জগৎশুদ্ধ হাহাকার ওঠে না, সে আবার কিসের মরণ ? তেমন মরণের সাধ পোষণ করিতে তোমার লজ্জা করে না ? ঘৃণা বোধ হয় না ?

আমি মরিবার পক্ষপাতী নহি। আমি বাঁচিতেই চাহি। গৃহের চতুঃসীমার মধ্যেও মৃত্যুর প্রবেশাধিকারে সম্মত নহি। বজ্রাহত হইয়াও মরিতে চাহি না, ঝঞ্ঝায় চূর্ণ হইয়াও মরিতে চাহি না, প্রলয়-প্লাবনে ডুবিয়াও মরিতে চাহি না। আর যদি মরিতেই হয়, এমন মরণ মরিতে চাই, শোকে যেন গৌরীশৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়ে, ধ্রুবতারা খসিয়া পড়ে, বসুন্ধরা মরুভূ হইয়া যায়। মরিতেই যদি হয়, মরণের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হইতে চাহি না। এমনি মরণ মরিতেই চাই- যেন সহস্রযুগ বর্ষা ঝরিলেও আমার ক্ষুদ্র পদচিহ্নগুলি ধরিত্রীর বক্ষ হইতে কিছুতেই না মুছিয়া যায়।

মরে কারা ? যাহাদের আশা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, যাহাদের সাধ নাই, সামর্থ্য নাই, যাহাকে কেহ চাহে না। তোমার কি ইহার কিছুই নাই? পূর্ণ, পরিপুষ্ট, পরিবর্দ্ধিত হইবার আশা কি তুমি রাখ না ? বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা কি তুমি কর না ? মাতৃপূজার অঞ্জলির ফুল লইবার সাধ কি তোমার নাই ? সকল দুর্ব্বলতাকে পাদলাঞ্ছনে বিদূরিত করিবার সামর্থ্য হইতে কি তুমি বঞ্চিত ? দেশ কি তোমাকে চাহে না ?

এই কথাগুলি একবার ভাবিয়া দেখিও। তারপরে যদি অবসর পাও, আত্মঘাতী হইও। এতগুলি কথা ভাবিবার পরে যে মরিতে চায়, তার মরণে আমি বাধা দিব না—দিতে পারিবও না। কিন্তু বাছা, না বুঝিয়া রাগে—অভিমানে —বৃথা মানবশে জীবনের দীপ অকস্মাৎ অকালে নিবাইয়া দিতে আমি বিষ্ঠার কীটকেও দিব না। আর তুমি ত' মানুষ।

আজ আমি তোমার নয়নে আশার রশ্মি জ্বালিতে চাই, তোমার হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষার বান ডাকাইতে চাই। নিশ্চয় ভগবান্ আমার সে বাসনা ব্যর্থ করিয়া দিবেন না। ইতি —

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষোড়শ পত্র

স্নেহভাজনেষু ঃ—

বৃথা দুঃখ গড়িয়া লইয়া অসহনীয় মর্ম্মদাহে নিরর্থক দহিয়া মরিও না। একটু ভাবিয়া দেখ ভাই, প্রকৃতই দুঃখিত হইবার সঙ্গত কারণ কিছু আছে কি না। প্রতীয়মান ব্যাপারের বাস্তবতার বিচার অনুমাত্র করিলাম না, কাণ্ডজ্ঞানের ব্যবহার করিতে চাহিলাম না, যাহা কিছু উত্তেজকতার মুখস পরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহারই দর্শনে অস্থির হইয়া পড়িলাম, —এইরূপ মানসিক অধৈর্য্য প্রশংসনীয় নয়।

কিসের তোমার দুঃখ।—অপরে তোমাকে মানে না, তাতে কি যায় আসে ? বিশ্বের সমগ্র নরনারীও যদি তোমার কথায় ওঠে, কথায় বসে,

তথাপি তাহাদের ইচ্ছা তোমার রোমকূপের একটি রন্ধ্র বৃহত্তর করিতে পারে না, একটী পক্ককেশকে ঘনকৃষ্ণ করিবার সামর্থ্য রাখে না। আবার, সকলেই যদি তোমায় ছাড়িয়া যায়, সকল সতীর্থ যদি নির্ব্বিশেষে জীর্ণ কন্থার ন্যায় তোমার প্রাণগত আদর্শের প্রভাবকে পরিত্যাগ করে, তথাপি তোমার পূর্ণতার সম্ভাব্যতা লুপ্ত হইবে না, তোমার সিদ্ধিপথ অগম্য রহিবে না। তুমি জীবন্ত রহিয়াছে, তোমার নিজেরই প্রাণময় প্রেম দিয়া, –অপরে আসিয়া তোমার আত্মার অমৃত-ভাণ্ডার রসে ভরিয়া দেয় নাই। সকল কন্টক তুমি শোণিতসিঁক্ত চরণে বিদলিত করিয়া পথ বাহিয়া চালিয়াছ–আপন পৌরুষে, সহচরেরা তাহাদের চাটুকারিতার অসম লঘুত্বে তাহা সুগম করিয়া দেয় নাই। তোমার অতীত তুমি নিজ হাতে গড়িয়াছিলে, তোমার জীবন অপরে গড়িয়া দেয় নাই। তোমার ভবিষ্যৎ তুমিই নির্ম্মাণ করিয়া লইবে, উহাতে অপরের কোন হাত নাই। তোমার স্বকীয় সাধনায় তুমিই সর্ব্বেসর্ব্বা, তুমিই ইহার সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র নিয়ন্তা। তুমি যদি ভোজ্য-পানীয় গ্রহণ না কর, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করিয়া দাও, কে তোমাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে? তুমি যদি ব্রহ্মচর্য্যে, ব্যায়ামাভ্যাসে, তৈলাভ্যঙ্গে নিয়মিত হও, তোমার পেশীর শক্তি এবং দেহের কান্তির পরিবর্দ্ধনে বাধা কে দিতে পারে! জগতের ইতিহাস একবার অধ্যয়ন করিয়া বল দেখি, কে কবে কাহাকে বড় করিয়া দিয়াছিল? সকল স্থানে এবং সকল কালে মানুষ বড় হইয়াছে–নিজের শক্তিতে, পরানুগ্রহে নয়। যাহারা তোমাকে মানিতে চাহে না, তাহারা মানিয়াও তোমাকে বড় করিতে পারে না, এই খাঁটি সত্য কথা জ্বলন্ত অক্ষরে মনের ফলকে লিখিয়া লও। দেখিবে, দুঃখ নিমেষকাল রহিবে না।

নাই বা গ্রাহ্য করিল, তাহাতে যায় আসে কি? ক্ষতিবৃদ্ধি কতটুকু? আমি যদি যথার্থই স্বদেশকে অখণ্ড-হৃদয়ে ভালবাসিয়া থাকি, উহাদের উপেক্ষায় দেশ আমাকে ফেলিয়া দিতে পারিবে না। দেশের সাধ্য নাই যে, সে আমার প্রাণভরা "মা" –ডাক শুনিয়া নিশ্চল ও নিঃস্তব্ধ হইয়া নির্জ্জীবের মত থাকিতে পারে। আমি ডাকিলে দেশ-জননীর স্তন বাহিয়া পায়োধারা বহিবেই, আমি কাঁদিলে তাঁর নয়ন বাহিয়া মুক্তা ঝরিবেই, উত্তেজিত কণ্ঠে আর্ত্তনাদ তুলিলে তাঁহার বক্ষঃ বেদনায় দুরু-দুরু করিবেই। ইহাকে রোধ করিতে কি তাহারা পারিবে, যাহারা একটা স্বার্থের মোহে, বিলাসের বিভ্রমে

তোমার কাজে সাময়িক ভাবে আপন ঢালিয়া দিয়াছিল ? দেশকে ভালবাসিয়া ইহারা আসে নাই, আসিয়াছিল একটা কৌতুক দেখিতে। সে কৌতুক দেখা হইয়া গিয়াছে, ইহারা এক্ষণে সঙ্ঘ হইতে খসিয়া পড়িবেই। তার জন্য আবার দুঃখ রাখিবে কেন ভাই ?

যাহারা আসিবার আসুক, যাহারা খসিবার খসুক, আমাদের বিবেচ্য উহা নয়। আমাদের বিচারের বিষয় হইল এই যে, আমরা নিজেরা পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি কি না। যদি পড়িয়া থাকি, তাহা হইলে প্রাণপাত শ্রমে ভুল পথ ছাড়িতে হইবে। যদি নিজের পথে অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহত কর্ত্তব্যে চলিতে পারিয়া থাকি, তাহা হইলে দ্বিগুণিত উৎসাহে অবশিষ্টটুকুকে অতিক্রম করিতে হইবে। জগৎ থাকে থাকুক, না থাকে না থাকুক, আমার সার্থকতা আমাকে বাব্‌লা কাঠের মত দহিয়া পুড়িয়া হইলেও কুড়াইয়া লইতেই হইবে।

তোমার যাহা কাজ, জগতের সকলেরই উহাই কাজ হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই। তোমার পক্ষে যাহা পীযূষ-প্রবাহ, অপরের পক্ষে তাহা কালকূট হইতে পারে। তোমার পক্ষে যাহা একান্ত করণীয় কাজ, তোমার অতীতের বন্ধুদের কাছে তাহাই এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে পরিবর্জ্জনীয় অপকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহাতে তোমার দোষও নাই, গুণও নাই। অতএব ইহা তোমার স্থির বুদ্ধিকে চঞ্চল করিবার সঙ্গতি রাখে না।

তুমি একাই সহস্র, যেহেতু তুমি দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছ। তবে পরের বশ্যতার প্রয়োজন কি ? তোমার দেশ-প্রেম যদি অকৃত্রিম হইয়া থাকে, ভূতে আসিয়া তোমার কাজ করিয়া যাইবে, অলসের পাল আসিয়া তোমার জন্য বেগার খাটিবে। তোমার হৃদয়ে যদি ভক্তির সুরধুনী বান ডাকিয়া থাকে, গঙ্গায় অবগাহন করিবার জন্য তোমাকে পরিব্রাজক সাজিতে হইবে না, পুণ্যসলিলা আপনি আসিয়া তোমার গৃহতলে দাঁড়াইবেন। ★ ★ ★ ★

কাজের জন্য ভাবিও না, কাজ চলিবেই, বসিয়া থাকিবে না। অনাদি অনন্তকাল হইতে এ পর্য্যন্ত জগতের কোন কাজই ঠেকিয়া থাকে নাই। আমাদেরটাও থাকিবে না। সুদৃঢ় প্রত্যয়ের উপর যখন কর্ম্মাকাঙ্ক্ষা প্রতিষ্ঠা পায়, তখন জানিও, উহার সাফল্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। কারণ,

মানুষের সাফল্যের মূলে যত কিছু রহস্য রহিয়াছে, সকলই হইতেছে ইচ্ছা-শক্তি। মানুষ শক্তিমান হয়-ইচ্ছারই দৃঢ়তায়, দুর্ব্বল হয়-ইহারই শিথিলতায়। ইচ্ছা যেখানে কুলিশ-কঠোর, সাফল্য সেখানে সূর্যোদয়ের মত অবধারিত। ইচ্ছা যেখানে কুসুম-পেলব, একটু প্রবল বায়ু বহিলেই মুসড়িয়া পড়ে, অসাফল্য সেখানে চির-নিদ্ধারিত। ইচ্ছা-শক্তিতেই অশোক অব্যাহত গতিতে বিপুল সাম্রাজ্য জয় করেন, ইচ্ছা-শক্তিরই প্রভাবে নেপোলিয়ান আল্পস্ গিরিমালার অস্তিত্বকে অগ্রাহ্য করেন। সেই ইচ্ছার বলে আমাদেরও বিজয় লাভ হইবে। দুর্ব্বলতার প্রাণঘাতিনী চিন্তা ললাটে পরাজয়ের ম্লান অগৌরব মাখিয়া দিতে পারিবে না।

নিজের আদর্শের প্রত্যয় যদি বাড়াইতে পার, তাহা হইলে ইচ্ছা ঘনীভূত, কেন্দ্রীভূত এবং দৃঢ়ীভূত হইবে। ফলে, যে অমৃতের আস্বাদনের লালসায় আমরা পাগল হইয়াছি, সে অমৃত অচিরে আমাদেরই হইবে। তবে দুঃখ রাখিব কেন ভাই ?

দল ভাঙ্গিয়াছে, ভাঙ্গুক। কিন্তু সাবধান! কেহ যেন কখনও একথা বলিতে না পারে যে, তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়াছে, তোমার ইচ্ছা ভাঙ্গিয়াছে, তোমার আদর্শ ভাঙ্গিয়াছে। দেহ বজ্রঘাতে বিদীর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তখনও যেন হৃদয় না হারাও। শত পীড়নের প্রলেপ সর্ব্বাঙ্গে লগ্ন হইতে পারে, কিন্তু তখনও যেন ইচ্ছার দুর্দ্দম্যতা অবিচ্ছিন্নই রহিয়া যায়। ইহজীবনে আদর্শের পরিসমাপ্তি না ঘটিতে পারে, কিন্তু উহাকে যেন কখনও খর্ব্ব করিয়া সকল আধ্যাত্মিক দুর্ভাগ্যকে ডাকিয়া না আনি।

মানুষ প্রকৃতই মরে তখন, যখন সে আদর্শকে অসংলগ্ন, অস্বাভাবিক ও অপূর্ণ করিয়া তোলে। দেহ-পরিবর্ত্তনেই মানুষের মৃত্যু নয়, মৃত্যু তার আদর্শের অপহ্নবে। সেই আদর্শকে যেন আমরা ব্যক্তিবুদ্ধির পূর্ণ মান রহিল না বলিয়াই পরিত্যাগ না করি।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের ব্যক্তিবুদ্ধিও কিছুতেই অবমানিত হয় না, যদি আমরা আদর্শকে পূর্ণ শ্রদ্ধা দেই। কারণ, আমাদের আদর্শেরই মধ্যে আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব পূর্ণতায় রহিয়াছে। কেহ আমার আদর্শকে আপনার আদর্শ ভাবিয়া মাথা পাতিয়া লইল না বলিয়াই যে, আমার আদর্শের অসম্মান

হইল, তাহা নহে। আমাদের আদর্শের অসম্মান আমরা নিজেরাই করি, বিরুদ্ধবাদীরা করিবার সামর্থ্য রাখে না। তোমার আদর্শের নিন্দা পরমুখ হইতে নির্গত হইলেই আদর্শ ক্ষুণ্ন হইল না। তুমি যদি উহার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তদ্-বিরুদ্ধ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই উহার অবমাননা করা হইল।

ভগবান্ করুন, এ জ্ঞানটুকু যেন আমাদের চির-জাগরুক রহে। তাহা হইলেই মানুষের গড়া নিন্দা-যশে আমরা বৃথা বিচলিত হইব না, মানুষের দেওয়া মান-অপমানে মিথ্যা দুঃখের সৃষ্টি করিয়া জীবন থাকিতেও নিরাশার অতল সলিলে ডুবিয়া মরিব না।

নূতন করিয়া কর্ম্মকেন্দ্র স্থাপিত করিয়া লও। বাজে, নিষ্কর্ম্মা, গল্পবিলাসী অলসগুলিকে গোড়া হইতেই একেবারে বাদ দাও। সব খাঁটি সোণা চাই। কাজের কাজী পাইলে সবই হইবে।

ভাল আছি, কুশলে নিশ্চিন্ত করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

সপ্তদশ পত্র

স্নেহভাজনেষু ঃ—

* * * যখনই যেখানে গিয়াছি, এমন মানুষ বড় একটা দেখি নাই, সকল মৃত্যু-সম্ভাবনাকে হেলায় ঠেলিয়া ফেলিয়া যাহারা জীবনের পথে চলিতে চায়। তিল তিল করিয়া সমগ্র জাতিটা মরণের গ্রাসে গড়াইয়া পড়িতেছে, কিন্তু কাহারও মনে একটা উদ্বেগ নাই, একটা আতঙ্ক নাই, আত্মরক্ষা করিবার জন্য একটা প্রাণপাত প্রয়াস নাই।

অবশ্য আমি মৃত্যুকে ভয় করিতে শিখাইব না। ইহজীবনে যদি কিছু শিখিতে পারি, তবে যেন একমাত্র মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করাই শিখি। যদি কাহাকেও কিছু শিখাইতে পারি, তবে যেন মৃত্যু-লাঞ্ছন হইতেই শিখাই। কিন্তু অনুভবশক্তি যাহার বিলুপ্ত হইয়াছে, সাহসেই হউক, আর শঙ্কায়ই

হউক, তাহার সে শক্তিটুকুকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আনন্দের অনুভূতিও অনুভূতি, বিষাদের অনুভূতিও অনুভূতি। অনুভূতিহীন নির্দ্বন্দ্ব জীবন অধ্যাত্মসাধকের লক্ষ্যীভূত হইতে পারে, কিন্তু পার্থিব দুর্দ্দশা যাহার সকল দূরদৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া দিয়াছে, দৈহিক অযোগ্যতা যাহার সকল আকাঙ্ক্ষাকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে, তাহাকে এই নির্দ্বন্দ্ব জগতে টানিয়া লইলে চলিবে না। তাহাকে বুঝাইতে হইবে যে, জীবন বড় উপভোগের বস্তু, ইহাকে হারাইতে নাই। তাহাকে জানাইতে হইবে, মরণ সকল সুখভোগ ছোঁ মারিয়া চিলের মত কাড়িয়া লইয়া যায়,– ইহার কাছ হইতে দুরে সরিয়া থাকিতে হইবে।

জানি আমি, আধ্যাত্মিক হিসাবে এই বুঝানটা ভ্রম। কিন্তু যাহার কোন বুঝ নাই, তাহাকে যা'তা একটা বুঝ দিতে পারিলেও আশ্বাসের কথা। আগাছার চাষ করিয়া কৃষকের মনে তৃপ্তি আসিতে পারে না, কিন্তু মরুভূমিতে শ্যামল কাঁটাগাছ দেখিলেও নয়ন জুড়াইয়া যায়। আগে এই মরুভূমিতে দু'টা কাঁটার গাছ জন্মাইতে হইবে, তারপরে উহারই ডাল-পাতা বাড়িয়া পচিয়া মাটিকে উর্ব্বর করিয়া দিবে। প্রথমেই দেশকে শিখাইতে হইবে–আমরা মরিতে চাহি না, বাঁচিতে চাহি। ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাইবার আমাদের বিন্দুমাত্র সাধ নাই, আমরা অক্ষয় হইয়া বাঁচিতে চাই। মৃত্যু, –সে যে ভয়ানক! একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব, ইহা অসহ্য। না, আমরা মরিব না, বাঁচিব। ঐ যে সাধ্য অসাধ্য সহস্র প্রকারের ব্যাধির বন্যা কলকল্লোলে ছুটিয়া আসিতেছে, ইহাতে ডুবিব না, ভেলাবলম্বনে নিরাপদ রহিব।

এমনই ভাবনা অন্তরে জাগিলে মানুষ আর নিশ্চেষ্ট রহিবে না। যতটুকু শক্তি আছে যার, সে ততটুকু দিয়াই মৃত্যুর দুর্জ্জয় রণোন্মাদ প্রতিহত করিবে। প্রয়াসে মানুষের শক্তি বাড়ে, ব্যায়ামে পেশী সুদৃঢ় হয়, আঘাতে আঘাতে আত্মবিশ্বাস উপচিয়া উঠে। ইহাদের তেমনই হইবে। ইহারা তখন শক্তিমান্ হইবে, সুদৃঢ় হইবে, আত্মশক্তিতে নির্ভর করিবে। তখন ত' জীবন-মৃত্যু ইহাদের পায়ের ভৃত্য আপনিই হইবে, তোমার আমার যুক্তির অপেক্ষা রাখিবে না।

জিজ্ঞাসা করিয়াছ, এমন নিশ্চেষ্ট ঔদাসীন্য মানুষের মনে আসিল কেমন করিয়া! ইহার উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নয়। তথাপি সকল কথা বলিব না, যেহেতু বলিয়া লাভ নাই। বিগতের অনুশোচনা করিয়া কাঁদিয়া মরিতে মানুষকে আমি বুদ্ধি দিতে চাহি না। ওগো মানুষ! যদি কাঁদিতে চাও, ইতিহাস ফেলিয়া দিয়া বর্ত্তমানের জন্য কাঁদ, ভবিষ্যতের জন্য কাঁদ। যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ফিরাইতে পারিব না, কিন্তু যদি ফিরাইতে চাও, তবে বর্ত্তমানকে ফিরাও, ভবিষ্যৎকে ফিরাও। নিজের বিধাতা–মানুষ নিজে, নিজেকার সুখ-দুঃখ সে নিজ হস্তে নির্ম্মাণ করিয়া লয়। অতীতের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতেই হইবে, কিন্তু সাবধান! বর্ত্তমানের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত কর, বর্ত্তমানের কথাকে সংযত কর, বর্ত্তমানের ভাবকে নির্ম্মল কর। মরিয়াছ তুমি অনেক কারণে, আর মরিয়াছ তুমি ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে। ছাগ-সুলভ কামের তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞান বজায় রাখিতে পার নাই, প্রবৃত্তির পদতলে সমগ্র জীবনের সমুজ্জ্বল সৌভাগ্য ডালি দিয়া এক্ষণে দুর্ভাগ্য-দগ্ধ হৃদয়ে কালযাপন করিতেছ। ইহা তোমারই ত'দোষ।

আর এদেশে অনুভূতিশীল মানুষ জন্মিবেই বা কি করিয়া? মাতৃগর্ভে সন্তানের প্রথম জন্মমুহূর্ত্তে কামোন্মত্ত স্ত্রী-পুরুষের প্রাণে কোন শুভ অনুভূতি থাকে কি? সন্তানের ভবিষ্যৎ জনক একটিবারও ভাবিয়া দেখে কি, তাহার কার্য্য অনন্তকাল বিশ্বজগতের জীবপ্রবাহের গতি-তরঙ্গে একটা করিয়া চিহ্ন রাখিয়া যাইবে। সন্তান যদি রুগ্ন হয়, অন্ধ হয়, খঞ্জ হয়, তবে একটা গোষ্ঠীর সমগ্র ভবিষ্যৎ রুগ্নতা, অন্ধতা ও খঞ্জতার সম্ভাবনায় কুণ্ঠা-মলিন হইয়া গেল। সন্তান যদি দস্যু হয়, তস্কর হয়, পরদারাভিমর্ষক হয়, তাহা হইলে সমগ্র সমাজ যে চিরকালের জন্য বংশানুক্রমিক একটা দুঃস্বপ্ন বুকে চাপিয়া রাখিতে বাধ্য হইবে। একবারও সে একথা ভাবে কি? যদি ভাবিত, তৎক্ষণাৎ সে বাহুপাশবদ্ধা সঙ্গিনীর সঙ্গ ছাড়িয়া আকুল কণ্ঠে চীৎকার করিয়া প্রার্থনা করিত, – "ভগবান্! যে পাপে মানুষ রুগ্ন সন্তানের পিতা হয়, সে পাপ হইতে আমাকে মুক্ত কর। যে অপরাধে মানুষ কুলাঙ্গার সন্তানের জনক হয়, সে অপরাধ হইতে আমাকে রক্ষা কর। যে দোষে মানুষ কামোন্মত্ত

হইয়া সন্তানের শুভ সম্ভাবনার কথা ভাবিতে ভুলিয়া যায়, সে দোষ আমার লুপ্ত করিয়া দাও।" —তারপর সে তাহার সমগ্র দেহের প্রতি একবার গভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া লইত, কঠোর সংযমের বলে শুষ্ক ধমনীতে শুক্র-প্রবাহ সতেজে বহাইত, দৈহিক ব্যায়াম সাধনে শরীরের তন্তু লৌহদৃঢ় করিয়া তুলিত। তারপর সে, জীবন-মরণে যে তাহার সকল ধর্ম্মকর্ম্মে সঙ্গী, সেই সহধর্ম্মিনীকে ডাকিয়া বলিত, —"বিধাতার বিধান আজ চাহিতেছে যে, আমাদের জীবন—শক্তি দেহভ্রষ্ট হইয়া এমন একটী মানুষ গড়িয়া তুলুক, পুরুষ হইলে যাহার রুদ্র তেজ জগন্ময় পাপরাশি নিমেষে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে, নারী হইলে যাহার স্নিগ্ধ-সুন্দর পবিত্রতা দগ্ধমরুর উষর প্রান্তরে শ্যামল কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিবে।"

কিন্তু পুরুষ ইহা ভাবে না, আর নারীদের কথা ছাড়িয়াই দাও। যে নারীর স্বভাব-পবিত্রতাকে উপেক্ষা করিয়া, তোমরা পুরুষের জাত, তাঁহাদিগকে অনুদিন উপভোগের সামগ্রী বলিয়া ভাবিয়া আসিয়াছ, যাঁহার জগন্মাতার অংশ-সম্ভবতার মর্য্যাদা দিতে কৃপণ হইয়া তোমরা তাঁহাকে মৎস্য, মাংস, তৈলাদির সহিতই তুলিত করিয়াছ, তাঁহারা একথা ভাবিবার সংস্কারটুকু পাইবেন কোথা হইতে ? তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভূষণ লজ্জা তুমি পাশববলে ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। তাঁহার স্বভাব-পুষ্ট ব্রহ্মচর্য্য তুমি দম্ভের বশে চূর্ণ করিয়াছ। অতএব যত কিছু দোষ, যত কিছু গ্লানি, যত কিছু নিন্দা সকলই তোমারই প্রাপ্য।

তুমি যুবক এবং গৃহী, তাই এইসব কথা একটানে লিখিয়া ফেলিলাম। কথাগুলি মনোযোগ দিয়া পড়িও এবং প্রতিপালন করিতে চেষ্টা করিও। মনে করিও না অসহায়া, অপ্রাপ্তবয়স্কা, অপরিণতাত্ম-বুদ্ধি বালিকার পিতা একদিন ধর্ম্ম-সাক্ষী করিয়া উহাকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি তোমার লালসার দাসী হইয়াছেন। পিতৃত্বের অভিমানে স্ফীত হইয়া জগন্মাতার অংশসম্ভূতা জননী-স্বরূপিণী নারীকে যে পরহস্তে সম্প্রদান করিয়াছে, সে ঘোরতর অন্যায় করিয়াছে। মা কি আমার এতই নগণ্যা যে, ছাগ-মহিষের মত দানবস্তু বলিয়া গৃহীতা হইবেন ? এ যে আমার দুঃখ দুর্গতি-নাশিনী মা কোটি বজ্রনিনাদি সন্তানের জননী। তোমার মত্ত অহঙ্কারে

ইঁহাদের অপমান অসম্মান করিতে পার, কিন্তু জানিও– ইঁহাদের রোষ-বহ্নি যেদিন প্রজ্জ্বলিত হইবে, সেদিন দাহন-জ্বালা হইতে বাঁচিবার জন্য সমুদ্র-সলিলেও ঠাঁই হইবে না।

মায়ের জাতিকে অত ছোট ভাবিও না। বরং শ্রদ্ধা করিতে শিখ এই বলিয়া যে, তোমার জীবন-প্রদীপ যেমন ইঁহাদের জঠর-যাতনার ইন্ধন না পাইলে জ্বলিত না, নিজের জীবনীশক্তিকে তিল তিল করিয়া ভ্রষ্ট করিয়া ভগবানের আত্মবিকাশবৈচিত্র্যের পূর্ণতা ঘটাইবার প্রেরণাও ইঁহাদের বাদ দিয়া লাভ করিতে পারিতে না; তোমাদের জীবন ভগবানের। তোমাদের কার্য্য ভগবানের। তোমাদের কর্ম্মফল ভগবানের। আর, সেই ভাগবতী বুদ্ধি এই মায়ের জাতিই প্রাণের মধ্যে জাগাইয়া দিয়াছেন।

পত্রে পত্রে কত কথাই আর বলা চলে। তবে শেষ কথা এই বলিয়া দেই–

১। কামবুদ্ধি লইয়া নারীর রূপদর্শন বা অঙ্গস্পর্শ করিও না।

২। সন্তান-কামনা ব্যতীত অপর কোনও কামনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া বীর্য্যত্যাগ করিও না।

৩। দুর্ব্বলদেহ, কুণ্ঠিতচিত্ত, আলস্যপরতন্ত্র, অধার্ম্মিক পরমুখাপেক্ষী সন্তানের জনক হইতে চাহিও না।

৪। সুস্থ, সঙ্গত, নিষ্ঠাপুত সংযমশুদ্ধ আধার ব্যতীত কুত্রাপি শুক্র ন্যস্ত করিও না।

এই কয়টী ক্ষুদ্র কথা যদি প্রতিপালন করিতে পার, দশ বৎসরের মধ্যে দেশের শ্রী ফিরিয়া যাইবে। তখন আর এই বর্ত্তমান নিরাশ-নিশ্চেষ্টতার সৃষ্টি-প্রকরণ অধ্যয়ন করিয়া ক্লান্তধী হইতে হইবে না।

ভাল আছি। কুশল দিও। ইতি–

শুভানুধ্যায়ী

স্বরূপানন্দ

অষ্টাদশ পত্র

স্নেহাস্পদেষু ঃ–

'সালঙ্কারে ও সবিস্তারে বর্ণিত' হইয়াছে যে, সত্য কথাটাকে অসত্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিব, অথবা 'বাঙ্গালী বড়ই ভাব-প্রবণ, বাঙ্গালীর জীবন কল্পনাময়' বলিয়া তরুণের নবজাগ্রত কর্ম্মাকাঙ্ক্ষাকে অবহেলার চক্ষে দেখিব, তেমন প্রবৃত্তি নাই। যাহাদের খুসী হয়, তাহারা বাঙ্গালীকে নির্বীর্য্য, নিষ্কর্ম্মা বলিয়া নিরস্ত রহুক, আমি কখনই তাহাদের দলে ভিড়িব না। অপরে যখন বাঙ্গালীর কথার ছড়ায় কেবল ছলনাই দেখিয়াছে, আমি তখন সেই বাঙ্গালীরই ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উৎসাহিত, উৎফুল্ল ও উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছি। যে ছলনা করিয়াছে, সাধু হইলে সে সকলের সেরা হইবে। যাহারা রত্নাকর ছিল, তাহারাই বাল্মীকি হয়। ক্ষণিকের দেখায় যদি তোমরা নিজের জাতিটার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করিতে চাও, তবে শুধু যে তোমার দেশের উপরেই অবিচার করা হইবে, তাহা নহে। সে অবিচার সমগ্র মানব-জাতির সভ্যতার উপরেও একটা অভাবের ছাপ না রাখিয়া যাইবে না। আমরা যদি মরিবারই হইতাম, মরিবার এত সুযোগ থাকিতেও মরিতে মরিতে বাঁচিয়া উঠিতাম না। এখনও আমাদের একটী পা শ্মশানের দ্বারে রহিয়াছে। কিন্তু মনে রাখিও, জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়াও আমরা বাঁচিব, নিশ্চয়ই নবজীবন পাইব, অমৃত আস্বাদন করিব।

মরিব না। বাক্-পটুতার ছায়াময়ী মায়া আমাদিগকে মারিতে পারিবে না, কারণ আমরা জীবনময় দেবতার আশিস পাইয়াছি। কূট চাণক্য–শিষ্যের শত সাবধানতার বাগুরা বিস্তার ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় মহিমা আমাদের যে দু-চারি জনকে আলিঙ্গন করিয়াছে, তাঁহারাই বলিয়াছেন,– "ওরে ভয় নাই, এগিয়ে আয়।" অগ্রগামীর সে আহ্বান যে পথিক শুনিয়াছে, সেই বলিয়াছে,–"ওরে ভয় নাই, এগিয়ে আয়" যাহারা পিছনে পড়িয়াছে, তাহারাও বলিতে চাহিতেছে,– "ওরে ভয় নাই, এগিয়ে আয়।" যাহারা চলিতেই চাহে, পথপাশে বসিয়া পড়িতে চাহে না, দুটা ঝুটা নিরাশার কথা কহিয়াই ফিরিয়া আসে না, তাহারা মরে না, শুক্‌নো পাতার মত জীবন-বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়ে না।

ভারতের উত্থান যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয়, তবে বাঙ্গালী উঠিবে

সর্ব্বাগ্রে; উঠিবে সে নিখিল ভারতের প্রতি অতুল মমত্ববোধ দিয়া, উঠিবে সে সমগ্র বিশ্বের প্রতি অনুপম প্রেম দিয়া। দৃষ্টি যাহাদের সুদূরে, তাঁহারাই বাঙ্গালীর অদূর গৌরবের উজ্জ্বল কিরীট দেখিয়াছেন– দেখিয়া স্তম্ভিত, বিস্মৃত, পুলকিত হইয়াছেন। ঝড়-ঝঞ্ঝার ঝাপটা-বাতাসের মাতাল পাগলামির মধ্য দিয়াও সে অনন্ত কোটি বিশ্ববাসীর জন্য শান্তির নীড় নির্ম্মাণ করিবে জানিও। অরুণ কিরণ প্রাচীর আকাশকেই প্রথম রঞ্জিত করে।

বাঙ্গালী হইয়া বাঙ্গালীর গ্লানি করিও না। বাঙ্গালীর কতটুকু তোমরা জান ? ক'জনকে তোমরা চেন ? বাঙ্গালার যাহারা মানুষ, তাহারা তোমার দেখা নাই বলিয়াই বাঙ্গালীর দোষ নহে। তুমি জান না তোমার অজ্ঞতায়। তুমি দেখ না তোমার অন্ধতায়। উহা তোমারই দোষ। আমাদের নিন্দা-প্রশংসা যাহাদের অঙ্গ স্পর্শ করে, বাঙ্গালার মানুষ তাহাদের গণ্ডীর বাহিরে। নীরবে তাঁহারা বিধাতার বিধান মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন, রৌদ্রে পুড়িয়াছেন, সংক্ষুব্ধ সাগরে নিশ্চিন্তে তাঁহারা ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছেন। অথচ তুমি-আমি তাহার খবর রাখি না বলিয়াই বাঙ্গালী জাতিকে গালি দেই, ছোট ভাবি।

বাঙ্গালার মাটিতে জন্মিয়া যে ধন্য হইয়াছি, ইহাই মনে রাখিও। এ মাটি মানুষকে ভালবাসিতে শিখাইয়াছে, মানুষকে মানুষের মর্য্যাদা দিতে শিখাইয়াছে। প্রথম চার্লসের চতুর্দ্দশ পুরুষের কণ্ঠস্থ কোষ্ঠী ভুলিয়া যাইও, নেপোলিয়ানকে বিস্মৃত হইও, কিন্তু নফর কুণ্ডুকে ★ স্মৃতিতে সজাগ রাখিও, শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ত্রিসন্ধ্যায় পূজা করিও। 'নফর' কেরাণী ছিল, রণ-বাহিনীর সেনাপতি ছিল না, দেশের 'নেতা' ছিল না। ভাবের নেতৃত্ব সে একটা উৎসর্গের মধ্য দিয়া যাহা করিয়াছে, তাহা অতুল্য, অমূল্য, অপরাজেয়।

এক দিক দেখিয়া অপর দিকের বিচার যাহারা করে, তাহারা মহামূর্খ।

★ নফর কুণ্ডু ঃ কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভবানীপুরে বকুলবাগান গলিতে এক সূত্রধর গৃহে স্বর্গীয় মহাপ্রাণ ত্যাগবীর নফরচন্দ্র কুণ্ডের জন্ম হয়। মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে তিনি কেরাণীর কাজ করিতেন। যথাশক্তি তিনি বিপন্ন ও অভাবগ্রস্থ লোকদের সাহার্য্য করিতেন, দুর্ব্বলদেহ শ্রমজীবির মাথা হইতে ভারী বোঝা তুলিয়া লইয়া স্বয়ং বহন করিয়া বহুদূরবর্ত্তী স্থানেও দিয়া আসিতেন; কিন্তু কখনও নিজের হৃদয়বত্তার কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিতেন না। কিন্তু একদিন তাঁহার আত্মোৎসর্গের সহিত তাঁহার যথার্থ পরিচয় আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িল। বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের ২৯শে বৈশাখ তারিখ প্রাতঃকালে তিনি ভবানীপুরের এক পথ দিয়া যাইতেছিলেন; এক স্থানে অত্যন্ত জনতা দেখিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার দেখিয়া পূর্ণিমাকেও কেহ তিমিরময়ী বলে কি ? গোময় দুর্গন্ধ বলিয়া চন্দনের কেহ নিন্দা করে কি ?

নিজের দেশটাকে ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। নিজের গ্রামটার ভিতর দিয়া দেশটা চিন। দেশটার ভিতর দিয়া বিশ্বকে চিন। গ্রামে যাও। মাটি খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া সেখানে

রত্ন খনি আবিষ্কার কর। স্তূপীকৃত জঞ্জালের তলা হইতে মাণিক্য উদ্ধার কর। যেখানে কথার বাহাদুরী নাই, চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে সভ্যতা নাই, সেখানে যাও; মায়ের মত মমতা লইয়া, ভাইয়ের মত স্নেহ লইয়া, পূজারীর মত শ্রদ্ধা লইয়া সেখানে যাও,–'পরাণ মণ্ডল', 'করিম শেখ' তোমাকে মানুষ চিনাইয়া দিবে। সহর ছাড়িয়া গ্রামে যাও, গ্রাম ছাড়িয়া মানুষের অন্তর-পুরে প্রবেশ কর, পথে ঘাটে মুক্তা ছড়ান রহিয়াছে দেখিয়া অবাক হইবে। ঋষির দৃষ্টি লইয়া মহাকবি যে গাহিয়াছেন,–

"শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্ল-কুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্"

তাহা কি শুধু কল্পনাই ? এই জ্যোৎস্না কি পবিত্রতার নয় ? এ কুসুম কি আত্মোৎসর্গের নয় ? এ দ্রুমদল কি শ্রেষ্ঠ আদর্শের মূর্ত্ত বিকাশ নয় ?

বিশ্বাস কর, বিশ্ব তোমার চরণ-রেণু চায়। বিশ্বাস কর, বিশ্ব তোমার নখর-মণির আলোকে উদ্ভাসিত হইতে চায়।

ভাল আছি, ভাল চাই। ইতি–

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

যে, ভূগর্ভে নর্দ্দমার মধ্যে দুইজন মুসলমান শ্রমজীবী মরণাপন্ন হইয়াছে। প্রথম ব্যক্তি ভ্রমবশে দূষিত বাষ্প-নির্গমের দ্বার উন্মুক্ত না করিয়াই নর্দ্দমার মধ্যে প্রবিষ্ট হয় এবং অচিরেই সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য দ্বিতীয় শ্রমজীবিও তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে চেতনা হারায়। ইহাদের এই প্রাণ-সংশয় অবস্থায় যখন রাস্তার লোক জমিয়া বৃথা কলরবই করিতেছিল, নফরচন্দ্র তখন এই দুই বিপন্নের উদ্ধারার্থ নির্ভীকচিত্তে নর্দ্দমায় প্রবেশ করিয়া জীবনদান করিলেন। যে স্থানে এই ঘটনা ঘটে, দেশীয় এবং বিদেশীয় মহানুভবগণের প্রদত্ত অর্থে সে স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়া এই বীর হৃদয় মহামানবের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ঊনবিংশ পত্র

প্রিয়—

যে কাজই কর, প্রবল সঙ্কল্প লইয়া করিও। বাধা-বিঘ্নকে অগ্রাহ্য করিয়া, লোকাপবাদকে পায়ে দলিয়া সে কাজ করিয়া যাইতেই হইবে। সমুদ্র-তরঙ্গের উপর দিয়াও ভেলা বাহিয়া যাইতে হয়, কার্য্যসিদ্ধি করিতে যাইয়া ডুবিয়া মরিব কি না, সে কথা ভাবিবার আমাদের অধিকার নাই। বিধাতার ইচ্ছায় যে প্রেরণা জাগিয়াছে, তাহা ত' আর হিসাব করিয়া জাগে নাই যে, সাফল্যের অসাফল্যের বিচার-বিবেচনা করিতে যাইয়া ঘরের অন্ধকারেই চিরটা জীবন বসিয়া রহিব? কাজেই যখন নামিলাম, তখন আর হিসাব-নিকাশ নাই।

কিন্তু হিসাব-নিকাশের কথাটাকে যাহারা মনে রাখিতে চাহে না, পারিপার্শ্বিকের প্রতিকূলতাকে যাহারা অগ্রাহ্য করিতেই চায়, তাহাদের পক্ষে সঙ্কল্পের সুদৃঢ়তারই প্রয়োজন আছে। লক্ষ্য যে তাহার পবিত্র, মহান্ ও নিষ্কলঙ্ক, এই কথাটাই তাহাকে সঙ্কল্পে দৃঢ় ও স্থির করিয়া রাখে। এই অসামান্য কার্য্যটাকে সুসম্পন্ন করিতে যাইয়া জীবনটা যদি গেলই, তবে ইহা যে বৃথাই যাইবে না, এই ভরসা তাহাকে সাহস দেয়। তাহার যে একনিষ্ঠা ও একাগ্রতা, উহা একটা দিগ্দেশব্যাপী যশের লিপ্সা হইতেই আসে না। বরং সত্যের সেবায় জীবন গেলেও উহা যে ধন্য হইয়াই যাইবে, এই আশাটাই তাহাকে আরও বল দেয়, হৃদয়ে আরও উৎসাহের সঞ্চার করে।

তবু লক্ষ্য স্থির করিবার সময়ে একবার সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তি ও হৃৎ-শক্তিকে ডাকিয়া আনিয়া তাহাদের প্রাণের কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হয়। যাহাকে জীবন মরণের শ্লাঘ্য গৌরব বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারা যায়, তেমন সমাপ্তিকে লক্ষ্য করিয়া না লইলে, প্রতি মুহূর্ত্তেই নূতন কার্য্য আসিয়া বিভিন্ন পথে টানিয়া লইবে, শেষে তাহার জন্য আবার অনুতাপের অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। লক্ষ্য যাহা, তাহা যেন আঁখির কোণে সলিল-বিলাসের সৃষ্টি না করে। আদর্শ থাকিবে উজ্জ্বল, নিষ্কলঙ্ক, নির্দ্দোষ। আদর্শ থাকিবে এমন, যাহাকে লাভ করিতে যাইয়া

মরিতেও শোক আসিবে না, দুঃখ আসিবে না, ভয়-ত্রাস প্রাণকে স্পর্শমাত্র করিতে পারিবে না। আদর্শ যদি অসম্পূর্ণ হইল, তাহা হইলে ক্রমবিকাশশীল মানুষের সকল সাধ, সকল আকাঙ্ক্ষাকে সে কেমন করিয়া পরিতৃপ্ত করিবে?

এই যে আমরা এক পথে চলিতে চলিতে সহসা অপর পথে চলিয়া যাই, তাহার কারণই হইল আদর্শের অপরিণতি বা লক্ষ্যের সঙ্কীর্ণতা। যে আদর্শ বা লক্ষ্য হিংসা-বিদ্বেষের উপর দাঁড়াইয়াছে, তাহার উদারতাই নাই। অতএব উহা জীবন মরণের সকল কামনাকে আপন উদরে লুকাইয়া রাখিতে পারে না। তাই, আমরা স্বদেশের সেবা করিতে যাইয়া নাম-যশের কামনাটাকে কিছুতেই উৎপাটন করিতে সমর্থ হই না। তাই, আমরা পতিতের উত্থান ঘটাইতে যাইয়া নিজেদের জন্মগত সামাজিক কৌলীন্যকে উপেক্ষা করিতে চাহি না। তাই, আমরা কথায় বড়, কাজে ছোট।

কপটতার কারণই ইহা। আমরা যাহা নহি, তাহাই দেখাইতে হইবে; যাহা করিব না, তাহাই বলিতে হইবে। কেন? কারণ, নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবলম্বন করিতে যাইয়া হৃদয়টাকে বাদ দিয়াছি, নতুবা বুদ্ধিবৃত্তিকে বিদায় দিয়া হৃদয়কেই "প্রাণের গৌরাঙ্গ" বলিয়া আলিঙ্গিয়া ধরিয়াছি। অথবা কাজে যখন নামিয়াছিলাম, নিজেকে তখন চিনি নাই, বুঝি নাই, পরখ্ করিয়া লই নাই। হৃদয়টাই ত' আর সর্ব্বস্ব নহে যে, উহারই তৃপ্তি দিয়া আমার মনুষ্যত্বের তৃপ্তি ঘটিয়া যাইবে। আমি যাহা, তাহা সকল বুদ্ধি ও সকল হৃদয়ের অতীত। আমি যাহা, তাহা কলা-কৌশল, ফন্দী-চাতুরী, দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতার অপেক্ষা রাখে না! অথচ, ইহাদের সকলেরই সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া আপন চেনা যায়।

সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া যে আদর্শ গড়িয়া উঠে নাই, উহাই অসম্পূর্ণ, অপরিণত, একদেশদর্শী, অতএব বিপথ-পরিচালক। তাই, সঙ্কল্পকে অটুট ও অক্ষত রাখিতে হইলে, আদর্শকে সম্পূর্ণ ও পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে। তার পরে যদি মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, আমরা নত হইব না। ধরণী চরণতল হইতে সারিয়া যায়, আমরা কক্ষচ্যুত হইব না। আমরাও এক-একটা গ্রহ-উপগ্রহ, চন্দ্র-সূর্য্য, ধ্রুব-শুকতারা। বিরাট মহাশূন্যের মধ্য দিয়া অনন্ত পথের যাত্রী আমরা, আকাশে আমাদের অবলম্বন নহে, ধরণীতে

আমাদের সংস্থিতি নহে, আমরা আপনাতে প্রতিষ্ঠিত, আপনাতে সংস্থিতি, আত্মরস-ভুক, আত্মাবলম্বী। আমাদের আবার ভয় কি? সঙ্কল্প তখন অদৃশ্য প্রেরণা,—কাহারও রক্তচক্ষুকে ভয় করে না, কাহারও হুকুম মানিয়া চলে না।

যেদিন আমরা আপন চিনিব, সেইদিনই আমরা এই কথাগুলি ভালরূপে বুঝিতে পারিব। তার আগে ইহা ধ্বন্যাত্মক ভাষাই রহিয়া যাইবে। তবু আমাদের আশা, উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষাকে বাড়াইতে হইবে। ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

★ ★ ★

ইতি —তোমার

স্বরূপানন্দ

বিংশ পত্র

কল্যাণবরেষু ঃ—

পত্র পাইয়াছি। ★ ★ ★ বীরপুরুষ সুযোগ-দুর্য্যোগের ধার ধারেন না। কর্ত্তব্যের আহ্বানে সংগ্রাম-সমুদ্রে তিনি ঝাঁপাইয়া পড়েন নিশ্চিন্তে-নির্ভাবনায়। অনুকূল পারিপার্শ্বিক যদি তাঁহার সাহায্য করে, সে অতি উত্তম কথা। আর যদি প্রতি পদবিক্ষেপেই প্রবল প্রতিবন্ধক গতিরোধ করিতে চায়, তবু তাহার উৎসাহ কমে না, নির্ভর হ্রাস পায় না। বীর যিনি, তিনি সুযোগেও বীর, অসুযোগেও বীর।

যদি ঠিক বুঝিয়া থাক, দেশের বুকে অজ্ঞানতার যে তীব্র অন্ধকার রাজত্ব করিতেছে, তাহাকে বিনাশ করা তোমার কর্ত্তব্য, মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিও না। যদি বুঝিয়া থাক, ব্যাথিতের অশ্রু মুছান তোমার কর্ত্তব্য, সুযোগের প্রতীক্ষা করিও না। পার হইতেই যদি হইবে, অনিশ্চিত জোয়ারের আশায় অনির্দ্দিষ্ট কাল বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? নৌকা ভাসাও, তাহার পর যাহা হইবার হইবে।

দেখিবে, কত বন্ধু শত্রু হইবে, কত আবার শত্রু বন্ধুর ছদ্মবেশ ধরিয়া ভুলাইতে আসিবে। কাহারও পানে চাহিও না, কাহারও কথা শুনিও

না। নির্ভয়ে, নির্ভাবনায় আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। নিজে ধন্য হও, দেশকে ধন্য কর।

পরের কথায় কাণ পাতিয়াই ত'মানুষ যত দুর্গতি ডাকিয়া আনে। নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতার উপরে নির্ভর রাখিয়া নরকে ডুবিতেও একটা আত্মপ্রসাদ আছে। প্রাণের প্রেরণাকে অগ্রাহ্য করিয়া পরের কথায় চলিও না। তোমার মুক্তি তুমিই অর্জ্জন করিতে পার, তোমার মোক্ষ তোমারই আপন হাতে।

সময় নাই। নহিলে আরও লিখিতাম। যথাসম্ভব শীঘ্র কাজ আরম্ভ করিয়া দাও। ফলাফল বাঞ্ছাময়ের হাতে। ★ ★ ★ ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

একবিংশ পত্র

কল্যাণবরেষুঃ—

যখন যে অবস্থায়ই থাক, সর্ব্বদাই প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করিও। কারণ, তুমি নিজে যদি বড় হইতে না চাহ, অপরে তোমাকে মহৎ করিয়া তুলিতে পারিবে না। আবার, প্রকৃতই যদি তুমি বড় হইতে চাহ, তবে এমন শক্তিধরই বা কে আছে, যে তোমার উন্নতিকে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখিতে পারে? আকাঙ্ক্ষা থাকিবে নদীরই মত। নদী যেমন আঁকা-বাঁকা পথ দিয়া দেশের পর দেশ অতিক্রম করিয়া যায়—একটা অতলস্পর্শ সাগরের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে, ঠিক তেমনি জীবনের অনেক সুযোগ-দুর্য্যোগকে পদবিদলিত করিয়া তোমরাও ছুটিয়া যাইবে—উচ্ছ্বসিতা স্রোতস্বিনীর মত জ্বলন্ত আদর্শকে বাস্তবের অরুণালোকে ফুটাইয়া তুলিতে।

যথার্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষা অনেকটা উৎসেরই মত। গভীর মৃত্তিকার নিম্ন হইতে আকুল আবেগে একটা জলোচ্ছ্বাস বাহির হইয়া আসিল, সে চাহিয়া দেখিল না যে, যে স্থানে তাহার জন্ম হইয়াছে, সে স্থান অতি দুর্গম, বাহিরে যাইবার পথ নাই, পরিতৃপ্তির উপায় নাই; বরং সহস্র-গুণিত উৎসাহে সে

জলোচ্ছ্বাস প্রস্তরগাত্রে আছাড়িয়া পড়িতে লাগিল। তারপর যেদিন সে একটি ক্ষুদ্র রন্ধ্রের মধ্য দিয়া আসিয়া শ্যামল প্রান্তরে পড়িল, সেই দিন সে একাই হাসিল না, প্রান্তরের পর প্রান্তর পত্রপুষ্পে সুন্দরতর হইল, জনপদবাসীরা পুষ্টদেহে আরও সুষ্ঠু হইল। যখন সে জলধারা দুর্গম জন্মস্থানের ক্ষীণ তনু ছাড়িয়া সমুদ্রের কণ্ঠ-বিলম্বনের যোগ্যতা পাইল, তখন ইহা হইল বিশ্বমানবের বাণিজ্যের তীর্থসলিল।

ঠিক তেমনই চারিভিতে সহস্র বন্ধন দেখিয়া সেই আত্মাটাকেও বাঁধিয়া রাখিতে চাহিও না, যিনি নিত্যমুক্ত, চিরস্বাধীন। তোমার উচ্চাভিলাষ গভীর চিন্তার ফলস্বরূপেই উদ্ভূত হইবে, কিন্তু যখন উহা চিন্তা-ভাবনার স্বাধর্ম্ম্য ছাড়িয়া কর্ম্মের স্বারূপ্য গ্রহণ করিবে, তখন যেন তাহা আকুল আবেগেই ছুটিতে থাকে, বিপুল উচ্ছ্বাসেই বহিতে পারে। চারিদিকে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধার গাত্রে যেন সে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিরন্তর আছাড়য়াই পড়িতে থাকে। তারপরে একদিন, একযুগ পরেই হউক, কি সহস্র শতাব্দী পরেই হউক একদিন যেন সে আকাঙ্ক্ষা উদার উন্মুক্ত আকাশতলে ক্ষীণ রেখায় হইলেও ভাসিয়া আসে, আর বিশ্বের ম্লান-মৌন মুখে হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে সে যেন চিরাভিলষিত চির-বাঞ্ছিত, চির-ঈপ্সিত, তাহার জাগ্রতের স্বপ্ন, স্বপনের জাগরণ –সেই লক্ষ্যে পৌঁছিয়া তেমন মহাতীর্থেরই উদ্ভব ঘটায়, যাহার পূত বারিরাশি বিশ্বমানবের শ্রীক্ষেত্রোৎসবকে ধন্য ও পুণ্য করিবে।

আমাদের যে জীবন, উহা ত' ব্যর্থ যাইবার জন্য নয়। আমাদের প্রাণের প্রত্যেকটা স্পন্দন বৈদ্যুতিক শক্তির মত লক্ষ হৃদয়ে কার্য্য করিবে, এই জন্যই ত' আমাদের সৃষ্টি। লোকে আমাদিগকে অবজ্ঞা করুক, উপেক্ষা করুক, যে অবজ্ঞা উপেক্ষা তাহাদেরই আপন অঙ্গে গড়াইয়া পড়িবে, পরন্তু আমাদের জীবনের সার্থকতা অব্যর্থই রহিয়া যাইবে। কারণ, আমরা ত' তাহারা নহি, যাহারা উজ্জ্বল উরুণোদয়ে কোটি কোটি অধঃপতিতকে কর্ম্মের অনুপ্রেরণা না দিয়া তৎপরিবর্ত্তে রক্তচক্ষুর শাসনে শ্রমবিমুখ ও কর্ত্তব্যকুণ্ঠ করিয়া রাখিয়াছিল। আমরা ত' তাহারা নহি, যাহারা গোধূলী-সঙ্গমের শঙ্খঘণ্টা রোলের মধ্যে বিশ্বদেবতার চরণতলে মস্তক নত না করিয়া অবাধ্য ঔদ্ধত্যে কত জাগ্রত নারায়ণের গাত্রে তাহাদের দুরন্ত পদযুগল তুলিয়া

দিয়াছিল। আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমাদিগকে ছোটকে বড় করিয়া তুলিতে ইঙ্গিত করিয়াছে, নীচকে উচ্চে তুলিতে আদেশ দিয়াছে ! * * * যাহাদের হৃদয়-যমুনা শুকাইয়া গিয়াছে, আমাদেরই ত' আলিঙ্গন পাইয়া তাহাদের মরাগাঙ্গে উজান বহিবে।

ভাইরে! তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যেন সর্ব্বত্র আপন প্রভাব ফুটাইয়া তোলে। সে যেন হিমাচলের অভ্রচুম্বী শিখর দেখিয়া ভয় না পায়, পুতিগন্ধময় নরককূপ দেখিয়া ঘৃণা না করে। নরকের মাঝে স্বর্গের নন্দন সৃষ্টি করা চাই, হিমাচলের উপরেও মাথা তুলিয়া দাঁড়ান চাই।

মনে যেন থাকে, প্রভাত-পাখীর মুখর কাকলী শুনিবার জন্য আমি বড় হইব, সন্ধ্যা-তারকার নীরব গীতি শুনিবার জন্য আমি বড় হইব, পূর্ণযামিনীর জ্যোৎস্না-প্লাবনে ডুবিয়া মরিতে আমি বড় হইব, হাসিবার জন্য বড় হইব, কাঁদিবার জন্য বড় হইব, স্বদেশের জন্য বড় হইব, বিদেশের জন্য বড় হইব, জাগ্রত জীবনে বড় হইব, বিস্মৃত মরণেও বড় হইব, বড় হইব সকল রকমে, বড় হইব সকলের জন্য। আকাঙ্ক্ষা যেন এমনি করিয়া বিশ্বকে জড়াইয়া ধরে।

হে প্রিয় নবীন সঙ্গী! আকাঙ্ক্ষাই তোমার নবজীবনের প্রথম মূলধন হউক। পরিশ্রমকে পণ্য করিও, সাফল্যরূপ সমৃদ্ধি তোমার কোষাগার পূর্ণ করিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

দ্বাবিংশ পত্র

প্রিয়—

তোমার গর্ব্বিত শির যেন কখনও মানুষের পায়ে অবনত হইয়া না পড়ে। যদি লুণ্ঠিত হইতেই হয়, সে যেন তাঁহারই চরণে লুটিয়া পড়ে, যিনি এই গর্ব্বিত শিরের মালিক —সকল গর্ব্বের প্রবর্ত্তক। আর যদি গর্ব্বিতই হইতে হয় সে যেন ইহারই গর্ব্ব করে যে, সে সেই পরম পুরুষেরই সন্তান, যাঁহার করধৃত ন্যায়দণ্ডের সমক্ষে বিশ্ব-সম্রাটেরও সমুন্নত শির নমিত হয়।

মানুষ মানুষের "দাস" নয়, সে তাহার স্নেহানুলিপ্ত কনিষ্ঠ। মানুষ মানুষের "প্রভু" নয় সে তাহার শ্রদ্ধাভিষিক্ত জ্যেষ্ঠ। ভ্রাতায় ভ্রাতায় লঘুগুরুর বিচার নাই, মনিব-গোলামের সম্বন্ধ নাই। একের হৃদয় অপরের হৃদয়কে অনুদিনই স্নেহের অনপনেয় বেষ্টনে আবরিয়া রহে। ভাই ভাইকে "ভাই" বলিয়াই বুকের পরে টানিয়া আনে।

মানুষের মনীষা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার কি আছে ? বরং আশ্চর্য্য হইও তাহারই অপার মহিমা ভাবিয়া, যাঁহার বিধানে মানুষের মন ক্রমবিকাশশীল। ক্ষুদ্র বীজটী যাঁহার নিয়মে বিবর্দ্ধিত হইয়া বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়, আবার বহু মহীরুহের কারণস্বরূপ অসংখ্য বীজের সৃষ্টি করে, তাঁহারই অচিন্ত্য মনীষা দেখিয়া স্তম্ভিত হইও। যে মানুষটীর মনীষা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ, সে মানুষ এখনও ফোটে নাই– এখনও মুকুলেই মুদিয়া রহিয়াছে। যখন সে ফুটিবে, তখন আবার কত অভিনব মনীষার স্ফুরণহেতু হইবে। কিন্তু তাহার জন্য বিশ্বপতির অনন্ত মহিমা ব্যতীত অপর কিসের প্রশংসা করিব?

প্রতীক্ষা কর, তুমিও ফুটিবে। যাহা তোমার বিস্ময়ের উদ্রেক করিয়াছে, তুমিও তাহাই হইবে, তাহাকে অতিক্রম করিয়াও যাইবে। শুধু নিজেকে বিশ্বাস কর। ফুটিবার দিন আসিয়াছে—আমরা ফুটিব, বিশ্বদেবতার মন্দির-প্রাঙ্গণে কোটি কোটি ফুটন্ত ফুল আমরা ভেদাভেদ-জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া একত্রে জুটিব, দেহ ও আত্মার উৎসর্গ দিয়া আমরা তাঁহারই চরণে লুটিব। নিজেকে বিশ্বাস কর,--সকল কল্পনা সত্য হইয়া তোমাকেও বরণ করিবে, সকল অকল্যাণ শিবস্বরূপে তোমাকে অভিনন্দন দিবে, সকল কুৎসিত সুন্দর হইয়া তোমাকে আলিঙ্গন-পাশে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া ফেলিবে। হে ধীমান্! শুধু প্রতীক্ষা কর। ★ ★ ★ ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ত্রয়োবিংশ পত্র

স্নেহভাজনেষু ঃ–

মানুষের যে জিনিষটীর সত্যিকার প্রয়োজন, সে জিনিষটী ঠিক সময়মত আসেই, তুমি তাহাকে চাও আর নাই চাও। প্রত্যেকটা প্রয়োজন তাহার একটা বিধিনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য লইয়া ছোটে। আর সেই লক্ষ্যের পরিসমাপ্তিতেই প্রয়োজনের নিঃশেষ। কে জানে কোন্ মহীয়ান্ আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া, কোন্ গরীয়সী প্রেরণা পাইয়া "মাতৃবৎ পরদারেষু" মহাভাব তোমার মধ্যে এমন উচ্ছ্বাসে, এমন জোরে জাগিয়া উঠিয়াছে। এই অপূর্ব্ব জাগরণের যে একটা সার্থকতা আছে, সে বিশ্বাস আমি রাখি।

জগৎ ভাবময়, আর সকল ভাবের সেরা মাতৃভাব! ডাক ত' দেখি একবার 'মা' 'মা' বলিয়া, তোমার প্রাণে দুর্ব্বলতা থাকে কতক্ষণ ? নিমেষে হতাশ-প্রাণে আশা আসিবে, অবশ-অঙ্গে উৎসাহ জাগিবে, শিথিল ধমনী কর্ম্মের উষ্ণ নৃত্যে নাচিয়া উঠিবে। শুধু প্রাণটা খুলিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া ডাক দেখি! 'মা' ডাকে দুঃখে শান্তি মিলে, শোকে সান্ত্বনা আসে, ভয়ে সাহস জাগে। সেই 'মা' যখন তোমার অন্তরে জাগিয়া উঠিয়াছেন তোমার আবার ভয় কি ? তোমার আবার আশঙ্কা কিসের? তোমার আবার সন্দেহ কেন ?

বিশ্বাস রাখিও, এই ভাবটা হৃদয়ে পোষণের তুমি সম্পূর্ণ যোগ্য। নিঃসংশয় থাকিও, এতবড় সত্যটাকে রক্তমাংসে মেদ-মজ্জায় নিজস্ব করিয়া লইবার পূর্ণ অধিকার তোমার অবশ্যই আছে। আর ইহাও মনে রাখিও, এই বিশ্বাসই তোমার কর্ম্ম-জীবনের প্রধান ভিত্তি। মাতৃপূজার প্রেরণা যখন তোমার প্রাণে পাইয়াছ, তখন ইহা ব্যর্থ হইবার জন্য পাও নাই। শুধু বিপরীত শক্তির সামঞ্জস্য বিধান করিও, সিদ্ধি আপনি ঘটিবে। স্বভাব নিজেতেই নিজেকে বিকশিত করে, জীবন আপনাতেই আপনি অভিব্যক্ত হইয়া ওঠে। মনটাকে শুধু সহজ করিও, সরল করিও, উদার করিও। আধ্যাত্মশক্তির উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ সকল ক্ষুদ্রতা, সকল নীচতা, সকল দীনতাকে চূর্ণ করিয়া আপনিই ডুবাইয়া দিবে।

অভাব দ্বারা যদি প্রাণের শক্তির অপচয় ঘটে, তবে তাহা শক্তি নামের যোগ্য নয়। একথা সহস্রবার সত্য। পরশপাথর লোহাকে সোণা করে, শক্তি দুর্ব্বলতাকে যেন কুহকস্পর্শে সবলতায় পরিণত করে। শক্তি দুর্ব্বলতাকে উপেক্ষা করে না, সাদরে তাহাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া আপন প্রকৃতি দান করে। শক্তি অভাবের দ্বারা অভিভূত না হইয়া অবশতাকে সে স্বকীয় অভিভবে পুঞ্জীকৃত সার্থকতায় মণ্ডিত করে। ইহাই শক্তির ধর্ম্ম, ইহাই শক্তির প্রকৃতি। জল যে দিকেই ঢালু পায়, সে দিকেই গড়াইয়া পড়ে, আর শক্তি যেদিকেই বাধা পায়, সে দিকেই আত্মস্ফুরণ করে। সূর্য্যের কিরণ পৃথ্বীগাত্রে বাধা পাইয়া উত্তাপ জন্মায়, বিদ্যুৎ নির্ব্বাত-প্রদেশে স্বাধীন বিস্তারের বাধা পাইয়া প্রবল ঔজ্জ্বল্যে জ্বলিয়া ওঠে। অভাব আছে বলিয়াই তোমার শক্তি একদিন অপূর্ব্ব জ্যোতিতে জ্বলিয়া উঠিবে, এ বিশ্বাস রাখিও।

আল্পস গিরিশ্রেণী অনেকের কাছেই অনতিক্রম্য, কিন্তু নেপোলিয়ানের কাছে নয়। বর্ব্বর আরব জাতির মধ্যে উজ্জ্বল একেশ্বরবাদ ও উন্নত সভ্যতার বিস্তার অনেকের কাছেই অসম্ভব, কিন্তু মহম্মদের কাছে নয়। পরের জন্য জীবন বিসর্জ্জন অনেকের কাছেই অভাবনীয়, কিন্তু দধীচির কাছে নয়। ঠিক তেমনই বিশ্বাস রাখিও, দুর্ব্বলতাকে দমন করা অনেকেরই সাধ্যের অতীত, কিন্তু তোমার নয়।

কোমল জিনিষকে ঘাতসহ করিতে হইলে তাহাতে আঘাত দিতে হয়। জীবনকেও দৃঢ় করিতে হইলে বিকাশের পরিপন্থী শক্তি আবশ্যক। লোহা আগুনে পুড়িয়া ইস্পাত হয়, বালুকারাশি বায়ুর চাপে পাথর হয়, জল শৈত্যের প্রভাবে নিক্ষেপযোগ্য আকার পায়। যেখানে চাপ নাই, সেখানে মাটি শক্ত হইবে কেন? যেখানে বাধা নাই, সেখানে জীবনই বা কর্ম্মক্ষম হইবে কেন? উত্থান-পতন লইয়াই জীবন, আর উত্থান-পতনের মধ্য দিয়াই জীবন ফুটিয়া উঠিবে।

মানুষ যে অনেক সময় আপ্রাণ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও সাফল্যে মণ্ডিত হয় না, তাহার কারণ বহির্বিশ্বে খুজিয়া পাইবে না। পাইবে—তাঁহার অন্তরে। বাহিরের বিভীষিকা কাহাকেও আচ্ছন্ন করে না, যদি তাহার মনের সাহস অটুট থাকে। আসল বাঘ বনে থাকে না, সে থাকে মনে। অন্তঃপ্রকৃতি

যদি তোমাকে উদারতার মধ্য দিয়া চালায়, সাধ্য কি বাহিরের লক্ষ সঙ্কীর্ণতা অপাপবিদ্ধ আত্মাকে স্পর্শ করে ? ভিতর হইতে যদি জ্ঞানের আলোক ফুটিয়া ওঠে, সাধ্য কি বাহিরের অন্ধকারের যে, সে তোমার দৃষ্টি-নিরোধ করে? বরং বাহিরের আঁধার মনের আঁধার ঘুচাইয়া দেয়, অন্তর্দৃষ্টিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। বন্ধনই মুক্তির দুয়ার খুলিয়া দেয়, মিথ্যাই সত্যকে প্রকটিত করিয়া তোলে। জীবনের যত উত্থান-পতন, যত জয়-পরাজয়, সবই ঠিক মনের মাঝখানটায়। বাহিরের শত প্রতিকূল শক্তি বিজয়ী মনকে দমন করিতে পারে না, আবার পরাজিত পরাঙ্মুখ মন বাহিরের শত অনুকূল অবস্থাকেও কাজে আনিতে সমর্থ হয় না। মনের শক্তি প্রভূত পরাক্রমে দিগ্বিজয় করে। মনকে তেজীয়ান্ কর, শক্তিমান্ কর।

যে কথা তোমার নিজের প্রাণে জাগিবে না, সে কথা তুমি গ্রহণ করিবে কেন ? যাহা তোমার চিন্তাপদ্ধতির অনুকূল নহে, তাহা তুমি স্বীকার করিবে কি জন্য ? প্রাণে যদি আকাঙ্ক্ষাই জাগিয়া থাকে, আর যদি সে আকাঙ্ক্ষাকে প্রাণময়ই দেখিয়া থাক, তবে পরের কথায় নিজের আদর্শ ত্যাগ করিবে কেন ? পরে ভাল বলুক, মন্দ বলুক, তাহাতে তোমার কি আসে যায় ? চিন্তার স্বাধীনতাকে কোন মানুষই, কোনও বিধানই অপহরণ করিতে পারে না। তুমিই বা পরের কথায়, পরের প্রণোদনায় সে স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিবে কেন ? জড়তা ত্যাগ কর, হতাশা বিস্মৃত হও, অবিশ্বাস দূর কর, স্বাধীন চিন্তাদ্বারা জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রস্থা অন্বেষণ কর। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

চতুর্ব্বিংশ পত্র

স্নেহভাজনেষু :—

পত্র লিখিলে আদৌ বিরক্ত হই না, কারণ, তোমার লেখার ভিতর দিয়া এই কথাটুকু জানিতে পারিতেছি যে, আমারই মায়ের একটা সন্তান আমারই আপন একটা ভাই, আপ্রাণ চেষ্টায় নিজের অস্ফুট শক্তিকে বিকশিত

করিয়া তুলিবার পন্থা অন্বেষণ করিতেছ। যতদিন পর্য্যন্ত তোমার পত্রগুলি পাইলে এই বিশ্বাসকে ক্রমেই সুদৃঢ়তর করিবার উপাদান পাইব যে, বিশ্বের শান্তি-কামনা করিয়া দিকে দিকে তেজস্বী মাতৃসন্তানেরা সর্ব্বতোভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইতেছেন, ততদিন পর্য্যন্ত এই সকল পত্র আমার নিকটে মহা-আদরের, মহা-সোহাগের এবং মহা-প্রয়োজনের হইয়া রহিবে। যে বীণায় আশার ঝঙ্কার বাজিয়া ওঠে, আমি সেই বীণাই শুনিতে চাহি। যে বজ্রে আত্ম-প্রত্যয় গর্জ্জিয়া উঠে, আমি তেমন বজ্রপাতই কামনা করি।

কিন্তু তুমি যদি কখনও মনে কর, কেহ যন্ত্রীর হিসাবে তোমাকে চালাইবার অধিকার রাখে, তবে তাহার অপেক্ষা বড় ভুল বা বড় অপরাধ কিছু হইতে পারে না। মানুষে মানুষে সর্ব্বত্র সমতা। অপরে যদি কর্ম্ম-প্রেরক হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমিও কর্ম্ম-প্রেরক হইতে পার। অপরে যদি প্রাণ-শক্তিতে ভরপূর হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমিও ঐ শক্তিতে ভরপূর হইতে পার। এ জগতে কেহ কাহারও ছোট নহে। কে কাহারও সৃষ্ট নহে, কেহ কাহারও ইচ্ছার দাস নহে। তোমার কার্য্য তুমিই করিতেছ, তোমার প্রেরণা তোমারই প্রাণ হইতে তুমি পাইতেছ, তোমার জীবন-মরণ, উত্থান-পতন, সকলই নিজ হাতে তুমিই গড়িতেছ। এখানে অপরের হাত নাই, অপরের প্রভুতা নাই।

আমরা তোমাদের সমকক্ষ। তোমরা আমাদের ভাই। একটা সর্ব্বজনীন মাতৃশক্তির সম্বন্ধ লইয়া তুমি-আমি আপনার জন। যিনি তোমার মা, তিনি আমারও মা বলিয়াই আমরা একে অন্যের সমীপবর্ত্তী। আমরা উভয়েই মায়ের সন্তান বলিয়া আমাদের একের কল্যাণে অপরের কল্যাণ, একের অকল্যাণে অপরের অকল্যাণ।

যদি কাহাকেও তোমার জীবনযন্ত্রের পরিচালক বলিয়া মনে করিতে চাও, তবে সেই পরিচালকত্বের পসরা জগন্মাতার স্কন্ধে চাপাইয়া দাও, তোমার-আমার নেতৃত্বের বোঝাটা তিনিই বহিয়া লইবেন। সন্তানের দেওয়া সকল কিছু তিনি সাগ্রহে ও সাদরে স্বীকার করিয়া লইবেন।

'সিদ্ধি চাই' 'সাধনা চাই' বলিয়া লোকে যে নিশিদিন জপিতেছে,

তাহাকে একেবারে নিরর্থক মনে করিও না। সাধুপুরুষ দেখিলে যেমন সাধু হইতে ইচ্ছা করে, সৎকথা শুনিলেও তেমনই সৎ হইতে ইচ্ছা করে। অতএব সৎকথারও বিশেষ প্রয়োজন আছে এবং সেই সকল কথা যিনিই বলুন না কেন, শ্রদ্ধাপূতচিত্তে গ্রহণ করিতে হয়।

কিন্তু কথা শুনিলেই হয় না, নিজের জ্ঞানবিশ্বাস অনুযায়ী কৰ্ম্মানুষ্ঠানে রত হইলে এবং লক্ষ্যলাভ-কল্পে জীবনের সকল সুখ সঁপিয়া দিলে, সকল দুঃখ অগ্রাহ্য করিলে, তবে সিদ্ধি মিলে। প্রকৃতই যদি কৰ্ম্ম কর, দেখিতে পাইবে, দূরস্থ সাধকদের একটা ক্ষীণ-ক্ষুদ্র কথাও তোমার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ নহে।

আকাঙ্ক্ষা যদি তীব্র হইয়া থাকে, পথ তোমার হইবেই। নিশ্চয়ই তুমি দুই চারিটা পথের কথা শুনিয়াছ বা জানিয়াছ, যাহাতে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছান যায়। গভীর চিন্তাসহায়ে উহারই মধ্যে একটা পথ বাছিয়া লও এবং চলিতে থাক। অপরের কথায় প্রতীক্ষা করিয়া লাভ নাই। যে ব্যক্তি পথে কখনও নামে নাই, সারাপথ সম্পূর্ণরূপে চেনা তাহার কৰ্ম্ম নহে, চিনিলে সে আধপথ চিনিতে পারে, আবছায়ার মত চিনিতে পারে।

তোমার পথ তোমাকেই দেখিয়া লইতে হইবে। তোমার চক্ষু ত' তোমারই ইচ্ছার অনুগামী।

স্পৰ্দ্ধা করিয়া যদি কেহ তোমাকে পথ দেখাইতে আসে, তাহাকে প্রতারক বলিয়া জানিও! যার হাত, তার ভাত। নিজে খাট, নিজেই নিজের অন্ন বাটিয়া লইতে পারিবে। আত্মশক্তিকে ভগবৎ শক্তির স্ফূরণ জানিয়া আত্মবিশ্বাসানুরূপ সাধন করিলে, সফলই হইবে। তজ্জন্য ব্যস্ততা নিষ্প্রয়োজন।

আত্মবিশ্বাসই সকল সাধনের প্রথম সোপান, আবার সকল সাধনেরই পরিণত অবস্থা আত্মবিশ্বাস। এই আত্মপ্রত্যয়ই অনুক্ষণ মানুষের অন্তরের মণিময় সিংহাসনে আসীন রহিয়া তাহাকে নিরুৎসাহে উৎসাহ দেয়, হতাশায় আশা যোগায়, বেদনায় উল্লাস-কণ্টকিত করিয়া তোলে। ইনিই তোমার সকল শিক্ষার শিক্ষক, সকল দীক্ষার আচার্য্য, তোমার মনোময়, প্রাণময়,

জীবনময় গুরু। ইনি যদি বিরূপ হইয়া বসেন, ইনিও যদি ক্ষণচাঞ্চল্যে বক্রদৃষ্টি করেন, সৃষ্ট জগতের শ্রেষ্ঠ জীবের মাথার মাণিক আসিয়াও তোমার কর্ম্মগতি সুরূপ করিতে পারিবেন না।

বাইরে থেকে তুই কি আমার
রুদ্ধ দুয়ার খুল্‌বি নাকি ?
আমিই যদি অলস মনে
ঘরের কোণে ঘুমিয়ে থাকি ?
আমিই যদি নিজের হাতে
অন্ধ করি যুগ্ম আঁখি,
আমিই যদি দিন-রজনী
দেই নিজেরে কেবল ফাঁকি ?

জগতের যত সাধন, যত ভজন, সব অকপট নীরবতার মধ্য দিয়াই সার্থক হইয়াছে। কিন্তু নীরব রহিতে পারে কে ? নিজেরই ভিতরে অখণ্ড-শক্তির অনন্ত স্ফুরণ সঙ্গোপনে যে সন্দর্শন না করিয়াছে, সে নীরব রহিতে পারে না। কল-কোলাহল ভিক্ষুকের স্বভাব, কুণ্ঠিত কণ্ঠই অকুণ্ঠিত নির্ল্লজ্জতার ভেকধ্বনির কর্কশতাকে আমন্ত্রণ দিয়া ডাকিয়া আনে, সমৃদ্ধিবানের অপেক্ষা মোসাহেবের পোষাকের চটক বেশী। যাহার ভিতরে যত বেশী দৈন্য রহিয়াছে, বাহিরের বৃথা আবরণে সে নিজেকে তত বেশী ঢাকিয়া রাখে। কিন্তু বাহিরের ভূষায় আপন আবরিতে যাইয়া যে বাহিরের জগতের সংগ্রামমুখর সরবতার ঘূর্ণীপাকেই পড়িয়া যায়।

গাছের মূল মাটির নীচেই থাকে। যেখানে কাহারও প্রশংসা বা বিদ্রূপ প্রবেশ করে না, এমন গভীরতায় আত্মগোপন করিয়া সে রেণু রেণু বালুকার তুচ্ছ তিক্ততায় প্রাণরস আহরণ করে। পথের মানুষের জ্ঞানের গোচরে না আসিয়া সে শুধু মাটির মানুষের খাঁটি মনের সাথে মনের সাধে আলাপ করে। যেখানে সমাধি-শয়নে সবাই সমান, সেখান হইতেই সে এমন অমৃতরাশি কুড়াইয়া লয়, যাহা প্রকৃতিবশে বাহিরে আসিয়া শাখা প্রশাখার শ্যামলতায় [illegible]-সুন্দর, যাহা কুসুমকুঞ্জের স্বর্ণ-সুষমায় মোহন-

মঞ্জু, যাহা সুপক্ক ফলের মধুময় আস্বাদনে স্নেহ-সুরস। বাহিরের ব্যাপারী শাখা-প্রশাখাকেই ফলদাতা বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু ভিতরের ব্যাপারে সে অন্ধই রহিয়া যায়।

বৃক্ষমূল যদি না জানিত, লোক-লোচনের অন্তরালে অনন্ত রসের খনি রহিয়াছে, সেও তাহা হইলে সূর্য্যের রশ্মিতে দগ্ধ হইয়া মরিতে বাহিরে ছুটিয়া আসিত, শূন্যোদরে বায়ু সেবনের অভিনয় করিয়া শীর্ণ প্রাণে শীর্ণতর হইত।

তোমারই ভিতরে অমূল্যরত্নের গোলকুণ্ডা রহিয়াছে, ভিক্ষা করিতে কাহার কাছে যাইবে? অনুনয়ের কাঙ্গাল, দৃষ্টিতে কেশরী আবার কোন্ শৃগালের মুখপানে চাহিয়া থাকিবে?

প্রকৃতই যদি তোমার লক্ষ্যলাভাকাঙ্ক্ষা উদগ্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই কথাগুলি তোমার কাজে লাগিবারই সম্ভাবনা। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পঞ্চবিংশ পত্র

স্নেহের—

* * * শান্ত মনে চিন্তা করিয়া দেখিও, তোমার এই দুর্ব্বহ জীবনটাও বৃথা নয়। ইহারও এমন একটা গূঢ় সার্থকতা রহিয়াছে, যাহাকে প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিবার জন্যই ভগবান্ তোমার অমন সরস প্রাণটাকে এই আবর্জ্জনা-স্তূপে চাপা দিয়া রাখিয়াছেন। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, এই আবর্জ্জনারাশি ঠেলিয়া ফেলিয়া যখন তুমি উন্নত শিরে উঠিয়া দাঁড়াইবে, সে দিন বিশ্বের প্রত্যেক প্রাণ তোমাকে শ্রদ্ধাভিনন্দনে সম্বর্দ্ধিত করিতে কতবড় আত্মমর্য্যাদা অনুভব করিবে। এ অগ্নিদাহ নিঃশব্দে সহ্য করিয়া একবার যদি বাহিরে আসিতে পার, তখন তোমার দেহের বর্ণ হইবে কতই গৌর, কত না উজ্জ্বল! তোমার অঙ্গকান্তি হইবে কত সুন্দর, কত প্রসন্ন। আজিকার এ দুঃখ কিন্তু প্রকৃতই দুঃখ নয়, বরং ইহা অনন্ত সৌভাগ্যের

উন্মুক্ত দ্বারস্বরূপ। আজ যাহা তোমার ক্ষণভঙ্গুর মান-অভিমানে আঘাত হানিতেছে, তাহাই তোমার অক্ষয় সম্ভ্রমকে জাগ্রত করিবে। আজ যাহা তোমার নিরপরাধ প্রাণকে শতধা খণ্ড করিয়া ফেলিতেছে, তাহাই যে আবার উহাকে অখণ্ড-গরিমায় মণ্ডিত করিবে। আজ যাহা অবসাদ আনিতেছে, কাল তাহা আত্মপ্রসাদ দিবে।

অগ্নি-পরীক্ষায় পড়িয়াছ বলিয়া তোমার জীবন কি বাস্তবিকই দুঃসহ? অমৃতের আস্বাদনে অমর হইব, এ ভরসা যাহার আছে, শতবারও কি সে নির্ভয়ে মৃত্যুর বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়ে না? মায়ের কোলে বসিতে পারিব,-এ কথা ভাবিয়া দুর্ব্বল শিশুও কি আছাড় পড়িতে পড়িতে জননীর কাছে ছুটিয়া যায় না?

তুমি যে নিজের ভবিষ্যতে কিছুতে বিশ্বাসস্থাপন করিতে চাহ না, এইটাই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। যে বংশে তুমি জন্মিয়াছ, সে বংশটাকে লোকে সম্ভ্রান্ত বলে না বলিয়াই যে তোমার আত্মসম্ভ্রম থাকিতে পারিবে না, এমন কথা কে বলিল? তুমি দরিদ্রের সন্তান, তাই বলিয়া ধনীর নন্দন তোমা অপেক্ষা কোন্ অংশে শ্রেষ্ঠ? তুমি শূদ্রের বংশধর, তাই বলিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তান কোন্ গুণে তোমার মাথার উপরেই উঠিয়া বসিবে? মনুষ্যত্বের হিসাবে তোমাকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কয়জনের আছে, আর কয়জনই বা প্রকৃত পক্ষে নিজের মর্য্যাদা বুঝিয়া চলে? সকলেই যদি নিক্তির ওজনে ব্যক্তিগত কৌলীন্য-অকৌলীন্য মানিয়া চলিত, তাহা হইলে আজ সমাজের এ দুর্গতি হইত না। কর্ম্মবীর আপনার অক্ষুণ্ণ ক্ষমতার গৌরব অর্জ্জন করিয়া গেলেন, আর তাঁহার অলস অকর্ম্মণ্য, অশক্ত বংশধরেরা তাঁহারই নামের দোহাই দিয়া তোমাদের ন্যায্য অধিকারকে চোপার জোরে চাপিয়া রাখিয়াছে। সে অন্যায়কে তোমরা স্বীকার করিবে কেন? সে অসত্যকে তোমরা গ্রাহ্য করিবে কি জন্য? প্রচার কর যে, ব্রাহ্মণ্যশক্তি তোমার মধ্যেও ফুটিয়া ওঠে। প্রচার কর যে, দধীচির মত তুমিও অস্থিদান করিয়াছিলে, সমাজের কল্যাণকল্পে অগস্ত্যেরই মত তুমিও সকল অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য হইতে স্বেচ্ছায় নিজেকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলে। আরও প্রচার কর যে, সমাজেরই হিতকল্পে পুনরায় তোমরা শীর্ষস্থানে আরোহণ করিবে, স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবে, মুক্ত হইবে। যত বিধি-নিষেধ তোমার উন্নতির পথে বিভীষিকার মত দাঁড়াইয়াছে,

বলদর্পিত চরণ-আঘাতে প্রত্যেকটাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দাও।

নিজেদের বাস্তব মহিমার সন্ধান যদি তোমরা পাইতে, তবে আজ দেবতার পূজায় জীবন সঁপিতে আসিয়া সঙ্কোচে মরিয়া যাইতে না। খনির গভীর তিমিরে যখন সোণার কণাগুলি অনাদরে পড়িয়া থাকে, তখন তাহারা জানে কি, যে, একদিন এই আঁধার ভেদিয়া তাহাদিগকে আলোকের জগতে উঠিতে হইবে, দেবতার মন্দির-গঠনে,—ভগবানের পূজাপীঠের পত্তনে ভক্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধার বিনিময়রূপে লক্ষ হস্তে ভ্রমিতে হইবে। বনের গহন আমোদিত করিয়া যখন বনফুল ফোটে, সেও তখন বুঝে না যে, দেবতার পায়ে তাহার অজ্ঞাত জীবন সার্থক হইবে। তোমাকেও এই আঁধার ভেদিয়া আলোকের জগতে উঠিতে হইবে, দেবতার পূজায় লাগিতে হইবে। শুধু একটিবার ভাবিয়া দেখ, তোমার সকল মনঃশক্তি, তোমার সকল কর্ম্মশক্তি বিশ্বদেবতার চরণতলে যেন সমর্পিত হইয়া গিয়াছে, — শুধু তাঁহারই ইচ্ছার সার্থকতার জন্য। তোমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা সেই সর্ব্বময়ের আশিস বাণীতে লীন হইয়া গিয়াছে,—শুধু তাঁহারই ইচ্ছা সফল করিবার জন্য।

সঙ্কোচ কিসের? বাগানের সব চেয়ে প্রস্ফুটিত গন্ধরাজটা যাঁহার সৃষ্টি, সব চেয়ে অসম্পূর্ণ পাতিগ্যাস্কাটাও কি তাঁহারই আপন হাতের রচা নয়? তাঁহারই জিনিষ তাহারই চরণে দিতে আবার সঙ্কোচ কেন? নিজের অঙ্গে যদি শত অসামর্থ্যও লোহার জঙ্কারের মত লাগিয়া থাকে, সেটা কি তাঁহার এমনই অগোচর যে, অবগুণ্ঠন টানিয়া হতশ্রী মুখখানাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে? প্রাচীনের বলীয়ান্ ব্রাহ্মণ যেমন করিয়া নিজেকে তাঁহার চরণে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, আজিকার প্রবুদ্ধ শূদ্রও তেমনই করিয়া তাঁহারই কাছে আত্মনিবেদন করিবেন। মানুষে মানুষে ছোট বড়'র বিচার মানুষে করিবে না, সে বিচারের ভার তাঁহারই উপর, সকলকেই যিনি প্রাণ-প্রবাহে ভাসাইয়া দিয়াছেন। তুমি শূদ্র নহ, তুমি ব্রাহ্মণ। তুমি মানুষ, অখণ্ড মানুষ, পূর্ণ মানুষ, অজেয় মানুষ, অ-বশ্য মানুষ। মানুষের সামর্থ্য-অসামর্থ্য, দোষগুণ, ভালমন্দ তাঁহার চরণে সঁপিয়া দিয়া তুমি মানুষই থাকিবে, শূদ্র রহিতে চাহিবে না, অমানুষের মত চলিবে না।

শত বাধাবিঘ্নের মুখে পরাজয়ের কালিমা মাখিয়া দিয়া তুমি বিজয়ী হও। ইতি-

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষড়বিংশ পত্র

প্রিয়-

একটা সম্বোধনের ব্যাপার লইয়া অত সুখ-দুঃখের অনুভব লইতে নাই, যেহেতু আমাদের স্নেহের বা আদরের সম্বোধন অপেক্ষা, স্নেহের বা আদরের কাজের মূল্য বেশী। একটা তুচ্ছ ক্ষুদ্র কথার মধ্যেই যদি নিজের সকল সুখ-দুঃখকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়, কর্ম্মের মধ্যে তবে উগ্র পীড়ন ও রুদ্র-দলনকে নির্ব্বিচারিত চিত্তে সহ্য করিবার অটুট সামর্থ্য উপার্জ্জন করিব কিরূপে? আমরা কর্ম্ম দিয়াই বাঁচি, কর্ম্মের শ্লথতাতেই মরি; কথার কুহেলিকা আমাদের প্রাণপ্রবাহে শক্তির সঞ্চার করে না, দেয় শুধু একটা মাদকতা। কথায় মানুষ মুগ্ধ হয়, কথায় হৃদয় স্নিগ্ধ হয়, কিন্তু এ মোহ অমর নয়, এ স্নেহশীলতা চিরস্থির নহে। প্রকৃতির ঝঞ্ঝাগর্জ্জনে এ মোহ টুটিয়া যায়, প্রতিযোগিতার কঠোর নিপীড়নে এ শীতলতা ঊষার শিশির কণারই মত নিমেষে শুকায়। জোয়ার আসিলেই ভাটা আসে, দিন থাকিলেই রাত্রি থাকে, ঘুমে থাকিলেই জাগিতে হয়। এ মাদকতার ঘোর বেশী দিন থাকে না, বাসী ফুলের যেমন গন্ধ থাকে না। নূতন যাহা, তাহাই মানুষের হৃদয়-মন জয় করিয়া লয়, তাহাই মানুষের কল্পনা-নয়নে অসীম দীপ্তিতে প্রতিভাত হয়। যাহা আমার আছে, তাহা চাহি না, কেন না তাহা পুরাতন, যাহা আমার নাই, তাহাই চাই, কেননা তাহা আমার পক্ষে নূতন। জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে এক অনির্দ্দিষ্ট অপূর্ব্বতা অনুভব করিতেছি বলিয়াই জীবন সুন্দর, সরস, উপভোগ্য ও আনন্দময়। যদি এই অভিযানকে চিরনবীনতায় অরুণ রাখিতে না পারি, প্রতিরজনীর অবসানেই যদি নূতন ঊষার নূতন কান্তি না দেখি, প্রতি অমানিশাতেই যদি

অন্ধকারের অভিনব সমাবেশ নিরীক্ষণ না করি, পুণ্যসলিলার প্রতি তরঙ্গে যদি নবলীলা-চঞ্চলতা, নবরঙ্গ-নর্ত্তন না লক্ষ্য করি, জীবনকে তবে আর সুন্দর রাখিতে পারিব না, উহা হইবে কুৎসিত, কুশ্রী, কদাকার, উহা আর উপভোগের সামগ্রী থাকিবে না, হইবে জঘন্য, জীর্ণ এবং পরিত্যাজ্য, আর আনন্দময় রহিবে না, হইবে বিষণ্ণ বেদনাপ্লুত, দুঃখাহত। নূতন আছি বলিয়াই বাঁচিয়া আছি, নূতন রহিব বলিয়াই বাঁচিয়া রহিব। কিন্তু নূতনত্ব কি কথায় আনিয়া দেয়? না, কর্ম্মে আসে?

যে ভাবেই ডাকি না কেন, তাহার আন্তরিকতা প্রমাণিত হইবে কাজের সময়। যাহাকে ভাই বলিয়া ডাকিয়াছি, যাহাকে আপন বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তাহাকে একটা ক্ষুদ্রতম অসুবিধা হইতে নিরাপদ করিবার জন্য যেদিন নির্দ্বন্দ্ব চিত্তে আত্মবলি দিতে পারিব, সেদিনই পূর্ণতঃ প্রমাণিত হইবে যে, আমার ভ্রাতৃ-সম্বোধন ব্যর্থ যায় নাই, আমার আত্ম স্বীকৃতি নিষ্ফল হয় নাই, আমার মুখের কথা যথার্থই প্রাণেরও কথা। কর্ম্মের কৌলীন্যে যে দিন কথার মর্য্যাদা রাখিতে পারিব, সে দিনই বুঝিব, কথা কহিয়া আমি অন্তরকে উন্মুক্তই করিয়াছি। সক্রেটিস একজনকে চিনিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার কথার দ্বারা। কিন্তু কালের চক্রে কথা দিয়া মানুষকে আজ আর চেনা যায় না, কারণ কথা দিয়া আমরা নিজেদের যথার্থ স্বরূপকে ঢাকিয়া রাখিতে শিখিয়াছি, অন্তর-পুরুষের বহিঃপ্রসারিণী বিশ্বতোমুখিনী জ্যোতির্ধারাকে মলিন করিয়াই দিয়াছি এবং দিতেছি। কথার জোয়ারে মানুষের ক্ষনিক কর্ম্ম-চাঞ্চল্য আসিতে পারে, কিন্তু তাহাতে জীবন জাগে না। প্রাণেরই মধুর পরশে অসীম হরষে জীবন জাগিয়া উঠে। কিন্তু প্রাণ যে তাহার পরশ দিবে, উহা কি কথায়, না কাজে?

ভুলিতে হইবে, কে কি বলিয়া ডাকিল, কে কি কথা কহিল। যদি বুঝিবার কিছু থাকে, তবে শুধু এই আছে, কে কিরূপে প্রাণের পরশ লইয়া আসিল! প্রাণ—অখণ্ড, অনংশ, সম্যক্। আমার প্রাণ তোমার প্রাণ বলিয়া ইতর-বিশেষ নাই। সকলেরই প্রাণ এক, সকলেই একই জীবনী-শক্তিতে প্রাণবান্। সাগর-সৈকতে ধূলি-রেণুগুলি যাহার পরশে সূর্য্য-কিরণে ঝিক্-মিক করে, বসন্তাগমে উদ্যানরাণী যাহার পরশে মনোমদ সৌরভে দশদিশি

মাখিয়া দেয়, তাহারই পরশ আমাদের প্রাণ, তাহারই পরশ আমাদের চিরন্তনী গতি। চলিতেছি বলিয়াই আমরা প্রাণবান, গতিহীন হইলে প্রাণহীনই হইতাম। কাহার ইঙ্গিতে এই নানা ছন্দের নানা রঙ্গের গতি-বৈচিত্র্য নদীর স্রোতের মত নিরন্তরই ছলছল কলকল করিয়া ছুটিয়াছে, তাহাই বুঝিতে হইবে। আর সব ভুলিয়া যাই, ক্ষতি নাই। মানুষ আসিল, তাহাকে আগে চিনিতাম না, এখন চিনিলাম। সে আসিয়া হৃদয়ের মাঝখানে বসিল, ভালবাসিতাম না, এখন বাসিলাম। কিন্তু এই যে পরিচয়, এই যে প্রেমপ্রীতি, ইহা কেমনে হইল? "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" –তবে ইহা আসিল কেমনে? যদি নাই জানিতাম, তবে জানিলাম কেমনে? যদি নাই ভালবাসিতাম, তবে বাসিলাম কেমনে? আর, নূতন হৃদয়টি আসিয়া যে আমার হৃদয়ে আকুলতার বান বহাইয়া দিল, এ অন্তঃসংযোগ ঘটাইল কে?

কোন্ এক অচিন্ত্য প্রকৃতিবশে আমি আগেই তাহাকে চিনিতাম, আগেই তাহাকে প্রাণভরা প্রেমে আবরিয়া রাখিতাম। বিশ্বের প্রথম বিকাশ-নিমেষ হইতে এই এক প্রেমেরই খেলা চলিয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডের নিখিল বিবর্ত্তন-ধারার মধ্য দিয়া এই প্রেমই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মানুষ স্বভাবতই প্রেমিক, স্বভাবতই কবি, স্বভাবতই রসিক, স্বভাবতই ঋষি। তাই সে ঘৃণা করিতে শিখিবার আগে ভালবাসিতে শিখিয়াছে, ভয় করিতে শিখিবার আগে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছে, পর চিনিতে শিখিবার আগে সকলকে আপন বলিয়া জানিয়াছে, দূর করিতে পারিবার আগে সকলকে নিকট করিতে পারিয়াছে।

যেখানে এই ধারার আত্মভাব জীবের প্রকৃতিগত, সেখানে মানুষে দেবতায় পার্থক্য নাই– সবাই মানুষ, সবাই দেবতা। আমি মানুষ নহি, যদি আমি দেবতা না হই। আমি দেবতা নহি, যদি আমি সকলকে আপন-করা প্রেমের বিমল আলোকে দীপ্যমান না রহি। দীপ্ত হয় বলিয়াই মানুষ দেবতা। প্রেমে সে দীপ্ত হয়, নিঃস্বার্থ আত্ম-বিসর্জ্জনে সে দীপ্ত হয়। সে দীপ্তি সকলেরই আছে, সে দীপ্তির সম্ভাব্যতা প্রত্যেকের মধ্যেই অটুট অক্ষত অনাবিলভাবে বিরাজমান রহিয়াছে। কেহ কাহারও অপেক্ষা ছোট নহে, কেহ কাহারও অপেক্ষা বড় নহে, আপন কর্ম্মে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা গড়িয়া মানুষ

দেবতা হয়, পথের ভিখারীও হয় যেমন, সাম্রাজ্যের শাসকও হয় তেমন।

তাই, নিজেকে দেবতা বলিয়া না জানিলে অপরকে দেবতা ভাবিবার অবসর নাই। নিজেকে দেবতা বলিয়া স্বীকার না করিলে অপরকে দেবত্বে মণ্ডিত দেখিতে পাইবে না। যাহাকে দেবতা বলিয়া ভাবি, সে যে আমারই প্রতিরূপ। শুধু তাই নয়, সে যে আমার আমিত্বটুকু লইয়াই দেব-শক্তিতে শক্তিমান, দেববীর্য্যে বীর্য্যবান্, দেবপ্রজ্ঞায় স্থিতপ্রজ্ঞ, দেব-প্রতিভায় মনীষী!

ভুল বুঝা ছাড়িয়া দিতে হইবে, আত্মবোধ লাভ করিতে হইবে। –না,–আমার এই জীবন-নৈবেদ্য যে আমারই ভোগ্য, অপর কাহাকেও ইহা নিবেদন করিবার জন্য নহে। ম্যালেরিয়া বা ওলাউঠায় যারা মরে, তাহাদের বাঁচাইতে যাইয়া যে ডালি প্রদান করিব, তাহা অপর কাহারও কাছে নয়, আমারই কাছে, আমার আত্ম-স্বরূপের কাছে, আমার অপ্রকাশিত, অস্ফুট, অনভিব্যক্ত পূর্ণতার কাছে। আমারই জগতে অবিরত অনন্তরূপে আমি আপন ছড়াইয়া রাখিয়াছি, নিজেরই প্রাণভরা প্রেমে নিজে মুগ্ধ হইয়াছি, নিজেরই জীবন-দেওয়া উৎসর্গে নিজের সন্ধান পাইয়াছি। আমি সর্ব্বত্র, আমি সর্ব্বদা, আমি সর্ব্বতোবাবে, তাই আমি দূরে নহি, নিকটেরও নিকটে, তাই আমি কাহারও হৃদয় টানিয়া আনি না অথবা কেহ আমার হৃদয় টানিয়া নেয় না, শুধু এই চিরনৈকট্যের মধ্যেও যে সান্নিধ্যের সংস্কারজ বিস্মৃতি, তাহাকে জ্ঞান বলে- প্রেমবলে দূর করিয়া দেই।

হৃদয় তোমার শূন্য নহে ভাই, প্রীতির পুণ্য-পারাবার তাহাকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাই উহাতে তরঙ্গ নাই, চাঞ্চল্য নাই, কোনও অসমাবেশ সেখানে অঙ্কপাত করে নাই। তবে আবার কাহাকে আনিয়া ঝিনুক ভরিয়া কুপের জল ঢালিতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় করিতে হইবে?

কাহাকেও না। কেননা, যাহা পূর্ণ, তাহাকে পূর্ণ করিতে হয় না।

তোমারই

স্বরূপানন্দ

সপ্তবিংশ পত্র

স্নেহাস্পদেষু ঃ—

সকল কথাই পড়িলাম। একে একে উত্তর দিতেছি।

প্রথম কথা মূল্য দিয়া মানুষের পরিশ্রমকে কিনিতে পার, কিন্তু শ্রমের মালিককে কিনিয়া লইতে পার না। ভগবানের রাজ্যে মাথা কেনা-বেচার অধিকার কাহারও নাই। মানুষের বিবেকের বিপণী কোথায়ও থাকিতে পারে না। তবু যে মানুষ নিজের দৈহিক অস্তিত্বটাকে পরের পায়ে বাঁধা দিয়া বসে, তাহা শুধু পশুশক্তির প্রচণ্ড আক্রোশকে স্বশক্তিতে পূর্ণতঃ প্রতিহত করিতে পারে নাই বলিয়া। কিন্তু, তার জন্য একথা কখনও বলা চলিবে না যে, তাহার মনোময় বিদ্রোহ মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় নাই। দেহশক্তি যোগ্য প্রতিকূলতা দিতে পারিল না বলিয়া সে নতশির হইয়া বশ্যতা স্বীকার করে; কিন্তু মনঃশক্তিকে অনুকূল করিবার পক্ষে উহা যথেষ্ট নহে। জাগতিক প্রভুত্বের উদ্ধত নেশায় তুমি আমাকে পদাঘাতে অপমান করিতে পার, আমি প্রতিঘাত করিতে পারি না বলিয়া সবই নীরবে সহিয়া লইলাম; কিন্তু তুমি যাহা করিলে, তাহাতে তোমার স্বাধিকার প্রসার পাইল না, সঙ্কুচিত হইল। কারণ, গায়ের জোরে তুমি আমার দেহখানির উপরে কর্ত্তৃত্বের লীলাখেলা করিতে পার, কিন্তু যতই আমার স্বাধীন ইচ্ছার অবাধ গতিকে তুমি তোমার স্বেচ্ছাচারের পাশবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিতে চাহিবে, আমার মনের উপরে তোমার অধিকার ততই কমিয়া যাইবে। আমাকে যদি পিঞ্জরে পূরিয়া রাখ, আমি তোমাকে ভালবাসিতে পারিব কি? আমার অঙ্গকান্তি যদি কষার আঘাতে কালী করিয়া দাও, মনোরাজ্যের মণিময় মধুর-সিংহাসনে বসাইয়া আমি তোমাকে পূজার অঞ্জলি ঢালিব কি? তুমি আমার দেহকে চাহিয়া মনকে হারাইয়াছ, কাঁচের কদর করিয়া জহরতের খনির মুখে বাধা-প্রাচীর গাঁথিয়া লইয়াছ। আমার মনটা যে আমার দেহের চাইতে অনেক বড়, অনেক সুন্দর! উৎকর্ষের যতগুলি মাপকাঠি তোমার ঐ দৃপ্তযুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে, সবগুলির হিসাবে দেখ, আমার মন কত প্রকারে কতটা শ্রেষ্ঠ। যে রাজ্যে লক্ষ-কোটি সৌরজগৎ অনন্তযুগ

ভ্রাম্যমাণ রহিয়াও প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে যাইতে পারিল না, যে রাজ্যে সংখ্যাতীত শক্তি প্রস্রবণ অনুক্ষণ প্রবাহিত হইয়াও জন্ম-জন্মান্তরে সমুদ্রের সন্ধান খুঁজিয়া পাইল না, সেই মনোরাজ্য হইতে নির্ব্বাসন-দণ্ড তুমি স্বেচ্ছাচারে অর্জ্জন করিয়াছ। আমার এই হীনশক্তি ক্ষীণ দেহকে ইচ্ছার ইঙ্গিতে চালিত করিয়াই তুমি দর্পদম্ভে ফাটিয়া মরিতে পার, কিন্তু "আমাকে" তুমি পাও নাই, পাইয়াছ আমার ক্ষণভঙ্গুর কায়াকে অথবা ক্ষণস্থায়ী ছায়াকে। আমাকেই যদি পাইতে, তবে সে পাওয়ার সাথে সাথে তোমার জন্য মলয়-পবন চন্দনগন্ধ বহিয়া আনিত, বর্ষাধারায় আশিস-কুসুম ঝরিয়া পড়িত। সকল শ্রমসমস্যার ইহাই চাবিকাঠি।

দ্বিতীয় কথা, তোমার কাছে অনুগ্রহ চাহিবার জন্যই যদি কাহারও জন্ম হইয়া থাকে, তবে সে জন্মিয়া আসিয়া তারপরে তোমার কাছে অনুগ্রহ চাহিত না, জন্মিবার আগেই তোমার অপার অনুগ্রহের মুখ চাহিয়া তবে সসম্ভ্রমে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করিত। দেহাত্ম অভিমানে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র "আমিকে' জগজ্জোড়া ভাবিয়া নিজেদের মধ্যে অনুগ্রহকারিণী শক্তির আরোপ করি। মিথ্যাকেই জীবন ভরিয়া ভালবাসিয়াছি, তাহারই অপরিহার্য্য ক্রমপরিণতি আমাদের মনোবৃত্তির গঠনকে পঙ্গু এবং ধারাকে পঙ্কিল করিয়া ফেলিয়াছে। তাই, আমরা মিথ্যাকেই শতবার সত্য বলিয়া ভাবি, আবার সত্যকে মিথ্যা বলিয়া অগ্রাহ্য করি। তাই, আমরা ভুল করিয়া তাহাকেই ভাবি ঠিক, চঞ্চল হইয়া তাহাকেই ভাবি স্থিরতা। তাই, আমরা জীবনের প্রতিষ্ঠাকে পতন বলিয়া ভাবি, আবার অধঃপতনতে উন্নতি বলিয়া মনে করি। তাই আমরা জীবনকে মৃত্যু ভাবিয়া পরিহার করি, মৃত্যুকে জীবন জানিয়া আলিঙ্গন-পাশে বাঁধিয়া লই। নহিলে, কুসুম-গন্ধ উপভোগ-কালে বিষধর আসিয়া দংশন করে কেন?

তৃতীয় কথা, দণ্ড-পুরস্কারের মালিক যদি মানুষ হইত, তবে আমি জগৎ ভরিয়া শুধু মানুষেরই কথা শুনিয়া যাইতে মুক্তকণ্ঠে বলিতাম। মানবাত্মা আপন অন্তরে যদি স্বেচ্ছাদত্ত শাস্তি লাভ না করিল, দু'দিনের জীব মানুষ আসিয়া তাহার কি করিবে? মানবাত্মা আপন অন্তরে যদি আত্মপ্রসাদ উপলব্ধি না করিল, জগতের পুরস্কারের পসরা মাথায় চাপাইয়া তুমি কি করিতে

সেও পারে, যদি সে দৃঢ় ইচ্ছায় চালিত হয়। অর্থাৎ "পারি না" বলিয়া যে সংস্কার আমরা গড়িয়া লইয়াছি, উহা ভ্রমের উপরে ভিত্তিমান্ হইয়াছে। মানুষ সকলই করে, মানুষ সকলই পারে, মানুষের ইচ্ছার কাছে সকল সমস্যা মীমাংসিত হয়। ★ ★ ★

পথ চলিতে গেলে চরণ-ক্ষত অনিবার্য্য। পথ যদি বন্ধুর হয়, তবে পদস্খলন হইতে পারে, পা ভাঙ্গিতেও পারে। কিন্তু তাই বলিয়া চলিবার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায় না। এমন খঞ্জ আমি দেখি নাই, চলিবার প্রয়োজন যাহার আদৌ নাই। খঞ্জ বলিয়া রেহাই নাই, তাহাকেও পথ চলিতে হইবে, তাহাকেও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিতে হইবে। পরে তাহার খঞ্জত্ব একদিন দূর হয়ই।

ভাল আছি। কুশল দিও।

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ঊনত্রিংশ পত্র

পরমকল্যাণাস্পদেষু ঃ-

তোমার পত্র পাইয়াছি। আকাঙ্ক্ষাকে বাড়াও। ক্ষুদ্রতা লইয়া থাকিও না, ছোটকে লইয়া তৃপ্ত রহিও না; আমরা চাই অনন্ত উন্মেষ, অসীম জীবন।

তেমন জীবন চাই, যাহা মরণে অভিভূত হয় না ; তেমন জীবন চাই, যাহা স্মরণে বিস্মৃত হয় না। তেমন জীবন চাই, যাহা জীবন-মরণের পার্থক্য ঘুচাইয়া দিবে, জীবনকে করিবে রৌদ্রদীপ্ত কর্ম্মময়, মরণকে করিবে শান্তিস্নিগ্ধ সিদ্ধিময়। জীবনকে চাই, মরণকেও চাই। নিজের জন্য চাই, দেশের জন্য চাই, বিশ্বের জন্য চাই। সে অমৃত পান করিতে চাই, যাহা প্রতি ধূলিকণায় প্রাণ-সঞ্চার করিবে, প্রতি প্রাণে অমর আকাঙ্ক্ষা দিবে, প্রতি আকাঙ্ক্ষায় একনিষ্ঠ সাধনার চরম অভিব্যক্তি ব্যঞ্জিত করিবে।

আকাঙ্ক্ষা বাড়াও, ছোট থাকিলে চলিবে না। বিশ্বের কল্যাণে তোমাকে বড় হইতে হইবে, জাতির কল্যাণে তোমাকে বড় হইতে হইবে, নিজের কল্যাণে তোমাকে বড় হইতে হইবে। মানুষের মত বাঁচিতে হইবে,

মানুষের মত মরিতে হইবে। আকাঙ্ক্ষা থাকিবে উদার, হৃদয় থাকিবে সরস, জীবন থাকিবে নির্ম্মল।

স্বপ্নের মত অস্পষ্ট কতবার কত মহামানবের ডাক শুনিয়া উঠিয়া বসিয়াছিলে, ঝিমাইতে ঝিমাইতে আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছ। আজ আবার দুঃখতপ্ত কোটি কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ তোমারই জাগরণ মাগিতেছে। ওগো! তুমি উঠ, তুমি জাগ, দুঃখের পঙ্কে সুখের কমলরূপে সহস্রদল মেলিয়া দাও। মনে করিও না, তোমার আত্মা উহাতে অভুক্ত রহিবে।

আশাকে যে বাড়াইয়াছে নিজেই সে বাড়িয়াছে। আশায় আশ্বস্ত হও, তোমরাই ত' মৃত্যুর ললাটে পরাজয়-চিহ্ন আঁকিয়া দিবে! যত জন্মের তপস্যায়ই হউক, ভগবানের চিরস্নিগ্ধ চরণচ্ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আশা যে পথের পাথেয়, আকাঙ্ক্ষা সে পথের প্রদর্শক। ইতি–

নিত্যকল্যাণকামী

স্বরূপানন্দ

ত্রিংশ পত্র

পরম স্নেহের–

মনে রাখিও, মানব-জীবন শুধু আপন জনের সন্ধানে আগাইয়া চলা। পর ভাবিলেই এই গতি গেল থামিয়া, হইল তোমার অপমৃত্যু। দূরকে নিকট করিবার সাধনারই নাম মনুষ্য-জীবন যাপন। নিকটকে দূর করিবার নাম পিশাচত্ব, রাক্ষসতা, দানবীয়তা। সকল পরকে আপন কর, সকল দূরকে নিকট কর, সকল দুঃখীকে সুখী কর, সকল ব্যথিতকে প্রফুল্ল কর, সকল অশান্তকে প্রশান্ত কর। সকলের সকল মর্ম্মদাহ নিজের বুকে টানিয়া আনিয়া সকলকে শান্তির স্নিগ্ধ-চন্দন-প্রলেপে শান্ত করার নামই তাহাদিগকে আপন করা।

মানুষ আপনার জন চিনিতে পারে না কেবল নিজের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখে বলিয়া। মানুষ পরকে আপন করিতে পারে না কেবল পরের দুঃখে নিজেকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না বলিয়া। মানুষ আপন জনকে পর এবং নিকটজনকে দূর করিয়া দেয় কেবল নিজের উপরে স্বার্থ, লোভ,

লালসা, বাসনা, কামনা ও চঞ্চলতাকে প্রভুত্ব করিতে দেয় বলিয়া। অথচ আপনার জনকে চিনিয়া লওয়ার জন্যই মানুষ পাইয়াছে প্রজ্ঞা, দূরকে নিকট করিবার জন্যই মানুষ পাইয়াছে অতি আশ্চর্য্য দ্রুত-ধাবন-শক্তি।

মননের বলে মানুষ চলে, তাই সে মানুষ। পশুরা পক্ষীরা চলে ক্ষুধাতৃষ্ণাদি নিতান্ত জৈব তাড়নায়, নিতান্ত প্রাকৃত প্রেরণায়। মানুষ মননের বলে চলে বলিয়াই সে পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদি সকলের মধ্যে নিজেকে দেখিতে পায় এবং দেখিয়া তাহাদের সহিত একাত্মতা অনুভব করে, আর সেই একাত্মতা বশতঃ পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গের প্রতি সদয়, করুণা-পরবশ ও সহানুভূতিশীল হয়। জৈব-প্রকৃতি-বশে একদিকে মানুষ যখন অজস্র পশুপক্ষ্যাদি হনন করিয়াছে, দৈব-প্রকৃতি-বশে তখন মানুষই আবার তাহাদের প্রতি অনুষ্ঠিত নৃশংসতায় লজ্জিত হইয়াছে। মননশীলতাই মানুষকে এই দৈব প্রকৃতির আধার করিয়াছে, নতুবা মানুষ অনন্তকাল অমানুষ বা পশুই হইয়া থাকিত।

তোমার মননকে তোমার ক্ষুদ্রস্বার্থের গণ্ডীর বাহিরে প্রসারিত কর। তোমার স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসনকে তোমার ব্যক্তিগত তুষ্টি, পুষ্টি ও তৃপ্তির পরিধি লঙ্ঘন করিতে বাধ্য কর। এমনকি মুক্তি চাহিতেও একার জন্য চাহিও না। স্বর্গলাভাদি অতি অকিঞ্চিৎকর প্রার্থনায়ও তোমরা এতকাল যে কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত হিতের দিকে তাকাইয়া চলিয়াছ, তাহা তোমাদের মানুষত্বকে খর্ব্বিত করিয়া রাখিয়াছে। যে স্বর্গ একবার পাইলে পুণ্যক্ষয়ের পরে আবার ছাড়িয়া আসিতে হয়, তাহাতেও তোমাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিই হইয়া রহিয়াছে প্রবল। তাই স্বর্গ হইয়াছে নরকের নামান্তর। মুক্ত পুরুষের স্বর্গ-নরকের ভেদ নাই। মুক্ত পুরুষ একবার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পুণ্যক্ষয় বা পাপভয় হেতু স্থানভ্রষ্ট হন না। কারণ, অনন্ত কোটি জগতের অনন্ততর কোটি কোটি প্রাণিবর্গের প্রত্যেকের প্রতি অহেতুক নিরবচ্ছিন্ন নির্নিমেষ প্রেমই তাঁহার স্বভাব। কিন্তু তথাপি এই মুক্তি এতকাল তোমরা কেবল একার জন্যই চাহিয়াছ, বিশ্বের প্রতিজনের জন্য চাহ নাই।

এইখানেই মানুষের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হইয়া রহিয়াছে। বিশ্বের সকলের জন্য চাহিবে তুমি মুক্তি, বিশ্বের সকলের জন্য পাইবে তুমি মুক্তি, বিশ্বের

সকলকে লইয়া সম্ভোগ করিবে তুমি মুক্তিসুখ, বিশ্বের একটী ক্ষুদ্র প্রাণীকেও বঞ্চিত না রাখিয়া তুমি মুক্তির মহামৃত করিবে আস্বাদন,- ইহাই হইবে তোমার জীবনের আদর্শ। এই আদর্শের অনুসরণ করিতে গিয়া তুমি বারংবার করিবে আত্মবলিদান এবং সেই উৎসর্গের মধ্য দিয়া আত্মপ্রসাদ প্রার্থনা না করিয়া করিবে বিশ্বপ্রসাদের আস্বাদন, তবে তুমি মানুষ হইলে, তবে তুমি সকলের আপন হইলে। আপন হওয়া সহজ কথা নয়, আপন করাও সহজ কথা নয়। সর্ব্বস্ব দিলে তবে আপন হওয়া বা আপন করা যায়।

কে তোমার আপন ? নিজেকে বারংবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। কাহার তুমি আপন ? নিজেকে বারংবার এই প্রশ্নও জিজ্ঞাসা কর। কাহার জন্য অকাতরে নিজ হাতে নিজের ছিন্ন মুণ্ড উপহার দিতে পারিবে, তাহা নির্দ্ধারিণ আগে কর। যেখানে আত্মবলি নাই, সেখানে আপনত্বও নাই। আত্মবলি দিয়াই আপন হইতে হয়, আপন করিতে হয়।

পাগলের প্রলাপ বকিলাম ত ? আমার কথা হয় ত' কেহ বুঝিবে না। কিন্তু বুঝিবে না বলিয়াই কি চুপ মারিয়া থাকিব? না, না, তাহা কখনও হইতে পারে না। কেহ বুঝিল না, তবু বলিব। কেহ শুনিল না, তবু বলিব। কেহ মানিল না, তবু বলিব। কেহ মূল্য দিল না, তবু বলিব। দাম পাইবার জন্য কথা বলিতেছি না, -আমার কথা আমার জীবনের অখণ্ডনীয় অংশ, চিরকাল আমাকে তাহা বলিয়াই যাইতে হইবে। ইতি-

নিত্যশুভানুধ্যায়ী

স্বরূপানন্দ

একত্রিংশ পত্র

নিত্যনিরাপৎসু ঃ-

সকল দুঃখ দুর্গতি যাঁহার স্নেহকোমল স্পর্শে মধুময় হইয়া যায়, একমাত্র তাঁহাকেই আপন বলিয়া জানিও এবং তনু-মন জীবন-যৌবন, তাঁহারই হাতে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিও। আপন চিনিতে যাইয়া ব্রহ্মাণ্ড

খুঁজিয়া বেড়াইও না। যেখানে দেখিবে ঝঞ্ঝা-বায়ুর মত দুঃখের বাতাস বহিতেছে, বর্ষা-ধারার মত ব্যথার অশ্রু ঝরিতেছে, নিঃসঙ্কে সেখানে স্ফীত বক্ষে দাঁড়াইও,–বজ্রে-বাদলে আপন চিনিতে পারিবে।

সূচিভেদ্য অন্ধতমসায় যদি ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গ তোমাকে দংশন করিতে চায়, –পালাইও না, পরাঙ্মুখ হইও না, কাঁপিও না–নির্ভীক চরণে দৃঢ় চিত্তে দাঁড়াও, "ভাই" বলিয়া তাহাকে বুকে তুলিয়া লইও, মুখে চুমা খাইও, তার দেওয়া দংশন-স্নেহ সাদরে গ্রহণ করিও। বিষের জ্বালায় আপন চিনিতে পারিবে।

নিবিড় অরণ্যের গহন পথে যদি ব্যাঘ্ররাজ তোমার বক্ষরক্ত চাহিয়া ঝম্প দেয়,–শঙ্কিত হইও না, স্তম্ভিত হইও না ; মৃত্যুর করাল মূর্ত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিও না। তোমার যে-টুকু সে চাহিয়াছে, সেটুকু তাহাকে দাও ভাই! দিলে ফিরিয়া পাইবে। যাহা দিবে, তার লক্ষ গুণ মিলিবে। বুকের রক্ত দিয়া মিলিবে–আত্মপরের নির্ভুল বিবেক।

কে আপন? –যে ছাড়িয়া যায় না, যাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি না। যে আমার আপন, সে না ডাকিলেও আসে, না বলিলেও আপন হাতে আসন পাতিয়া বসে। যে আমার আপন, ব্যথা দিলে সে ফিরিয়া যায় না, দুঃখ দিলে নিরাশ হয় না, গালি দিলে কম করিয়া স্নেহ করে না, ভয় দেখাইলে ভাবে না। তাহাকে সাধিতে হয় না, বাঁধিতে হয় না,– আপন প্রেমে সে আপনি বাঁধা পড়ে, নিজের বাঁশী সে নিজে সাধিয়া লয়।

কে আমার আপন ? –যে আমায় দুঃখে দুঃখে দহিয়া মারে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও পুড়িয়া মরে। যে আমার আঁখির কোণে খোঁচা দিয়া খামাখা কাঁদায়, আবার নিজেও কাঁদিয়া বুক ভাসায় ; যে আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া লইয়া রক্তের হোরী খেলে, আবার ব্যথার ছলে আমারই সাথে ঢলিয়া পড়ে।

কে আমার আপন জন ? কে আমার প্রাণের জন ? –যে আমার জীবন জোড়া আশার কুঞ্জ নিমেষে বাতাসে মিশায়, কোকিলার কাকলী ভুলাইয়া দেয়, ভ্রমরার গুঞ্জন কাড়িয়া নেয়, সকল সাধের মোহনবেণু মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া দেয়, বীণার তার ছিঁড়িয়া ফেলে,–সকল কণ্ঠ মূক করিয়া,

সকল ধ্বনি রুদ্ধ করিয়া, নাদে– শুধু অনাহত নাদে বিশ্ব বেড়িয়া ধরে।

সে যে আমার দুঃখেরই ছদ্মবেশ পরিয়া আসে, কাঁটার মালা গলায় পরে, আগুনের পোষাক গায়ে দেয়। তার আলিঙ্গনের সুখস্পর্শ পাইতে হইলে কাঁটার ব্যথা, দহনের জ্বালা সইতে হয়। যতই তার বুকের কাছে যাইতে চাই, বেদনা ততই বাড়িয়া উঠে। পুড়িতে পুড়িতে যখন সর্ব্বাঙ্গের সকল ময়লা-মাটি ছাই হইয়া যায়, সংসারের কামনার আঠা ফোস্কার সাথে খসিয়া পড়ে, সকল ছোট-বড় জ্ঞান, সকল মান-অভিমান বাষ্পের সাথে উড়িয়া যায় ;– একটু একটু করিয়া বিঁধিতে বিঁধিতে তার কণ্ঠহারের কাঁটা যখন আমার হৃদয়ে বিঁধিয়া যায়, যখন আর সইতেও পারি না, রইতেও পারি না, তখন সে হয় আমার আপনার আপন, তখন সে হয় আমার জীবনের জীবন।

একমাত্র তাঁহাকেই আপন ভাবিও, একমাত্র তাঁহারই কাছে মনের কবাট খুলিয়া দিও ; তাঁহারই জন্য বাঁচিও, তাঁহারই জন্য মরিও। জীবন-মরণের সকল সমস্যা, সকল মীমাংসা তাঁহারই হাতে সঁপিয়া দিও।

ইহাই আমার সকল ব্যাধির মহৌষধ, ইহাই আমার সকল বিস্ফোটকের সন্তাপহারী শান্তি-প্রলেপ। –এই মহৌষধ তোমার লাভ হউক। ইতি–

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

–ঃ সমাপ্ত ঃ–